চতুর্থ অধ্যায়

ইসলামের জন্ম-বিকাশ ও প্রাসাদ ষড়যন্ত্র

"There are no boundaries or chains for freedom of thinking...To deny secularism is to ignore the essence of modern civilization...To call for a religious state is to ignore human rights...To call for a return to the Islamic Khelafa is to ignore history...Oh, Reader of future times: read what we wrote, learn how a human being can take a stance, how we crafted with our pens a new age of enlightenment, and how words are more powerful than bullets." অর্থাৎ চিন্তার স্বাধীনতার কোনো সীমারেখা নেই, অথবা কোনো শিকল...সেক্যুলারলিজমকে অস্বীকার করা মানে আধুনিক সভ্যতার মৌলিক গুণাবলীকে উপেক্ষা করা...ধর্মীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা মানে মানুষের মানবিক অধিকারকে অগ্রাহ্য করা...ইসলামি খেলাফতে ফিরে যওয়ার প্রচেষ্টা হচ্ছে ইতিহাসকে অস্বীকার করা...হে আগামীদিনের পাঠকেরা, পাঠ করো আমরা কি লিখেছি, শিখো কেমন করে একজন মানুষের বৌদ্ধিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে, কেমন করে আমাদের কলম নতুন যুগের আলোকায়ন সূচিত করেছে, কেমন করে শব্দ গুলির থেকেও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। —মিশরীয় মানবাধিকার কর্মী, লেখক ফারাজ ফাদা (Faraj Fada, ১৯৪৬-১৯৯৬)।

(১)

কোরায়েশ বংশের দুই শাখায় নবী মুহাম্মদ ও হজরত ওসমানের জন্ম। তাঁদের দুজনরেই পূর্বপুরুষ আবদে মনাফ। আবদে মনাফের দুই পুত্র ছিলেন : আবদে শামস ও আবদে হাশিম। আবদে শামসের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র উমাইয়া নেতৃত্বের দাবি করায় চাচা আবদে হাশিমের সাথে বিবাদ বাঁধে। এই বিবাদে কোরায়েশ বংশ দুই দলে বা গোত্রে বিভক্ত হয়ে যায়; হাশিমি গোত্র ও উমাইয়া গোত্র। বিবাদের মূল কারণ সম্পদ। শেষ পর্যন্ত নেতৃত্ব ভাগাভাগি করা হয় এইভাবে—কাবা ঘরের স্বত্বাধিকার ও তত্ত্বাবধান এবং হজ (দেব-দেবী দর্শন) মৌসুমে আয়কৃত অর্থের মালিকানা থাকবে হাশিমি গোত্রের হাতে। আর দেশ প্রতিরক্ষা-প্রশাসন ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদের মালিকানা উমাইয়া দলের হাতে। পরবর্তীতে উমাইয়া বংশ বুঝতে পারলো এই ক্ষমতা ভাগাভাগিতে তাদের যথেষ্ট ক্ষতি হয়ে গেছে। নবী মুহাম্মদের (দঃ) জন্ম পূর্ববর্তী আরবে যুদ্ধবিগ্রহ বা ধর্মীয় জেহাদ তেমন ছিল না বললেই চলে। নগর শাসনে উমাইয়াদের অর্থোপার্জন, কাবা গৃহের আয়ের তুলনায় ছিল অতি নগন্য। ধনে-মানে উমাইয়া গোত্র, হাশিমিদের চেয়ে অনেক পিছিয়ে পড়লো। কিন্তু তারা সামরিক বিভাগ ও প্রশাসনের মাধ্যমে রাষ্ট্রনীতি, কূটনীতি ও শিক্ষা-দীক্ষায় অনেক এগিয়ে ছিল। এবার অর্থনৈতিক সমস্যা দূরীকরণে বুদ্ধিমান উমাইয়াগণ ঝাপিয়ে পড়লো ব্যবসা-বাণিজ্যে। কূটনৈতিক অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে তারা যেমন ব্যবসা-বাণিজ্যে, অর্থোপার্জনে প্রচুর উন্নতি করে, উপরন্তু বহির্বিশ্বের সাথেও সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। উমাইয়া ও হাশিমি দুই দলের মধ্যকার বৈষম্য, বিবাদ, হিংসা-বিদ্বেষ দিনদিন বাড়তে থাকে। আর তা এক পর্যায়ে হাশিমি দলের অন্যতম শক্তিশালী নেতা, একাদশ সন্তানের জনক আব্দুল মোত্তালিবের সময়ে এসে চরমাকার ধারণ করে। আব্দুল মোত্তালিবের পুত্র আব্দুল্লাহ ও আবু তালিবের ঔরসে যথাক্রমে মুহাম্মদ (দঃ) ও হজরত আলির (রাঃ) জন্ম।

উমাইয়ার দুই পুত্র ছিলেন। হারিব ও আবুল আস। হারিবের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন আবু সুফিয়ান আর আসের ঘরে হাকাম ও আফ্ফান। ৫৭০ খ্রিস্টাব্দের যে বছর ইয়েমেনের বাদশাহ আবরাহা মক্কা আক্রমণ করেন, সে বছর হাশিমি গোত্রের আব্দুল্লাহর গৃহে মুহাম্মদ (দঃ) জন্মগ্রহণ করেন। তার ছয় অথবা সাত বৎসর পর উমাইয়া বংশের আফ্ফান পত্নী উর্দির গর্ভে হজরত উসমানের (রাঃ) জন্ম হয়। শিশু বয়সে যেমন মুহাম্মদ (দঃ) পিতা আব্দুল্লাহকে হারিয়ে চাচা আবু তালিবের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হন, হজরত উসমান (রাঃ) ও কিশোর বয়সে পিতা আফ্ফানকে হারিয়ে চাচা হাকামের আশ্রয় গ্রহণ করেন। উমাইয়া ও হাশিমিদের আত্মকলহ, গোত্রীয় সংঘাত, বহুঈশ্বরবাদ আর ধর্মীয়-উপাসনালয়ের মালিকানা জবর-দখল নিয়ে আরব যখন অবনতির চরম পর্যায়ে তখনই বিপরীতমুখী মুক্তবুদ্ধি এবং উদার দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির একদল মুক্তমনার আবির্ভাব ঘটে। যাদের তৎকালীন সময়ে 'হানিফ' নামে আখ্যায়িত করা হতো।[১] মুহাম্মদ (দঃ) তখন যুবক। ওয়ারাকা বিন- নওফল ও জায়েদ ইবনে আমর বিন- নওফল[২] ছিলেন সেই 'হানিফ' দলের

[১] আরো দেখুন : Richard Bell, *Who Were The Hanifs?*, *Muslim World*, Volume XXIX, 1949, Page 120-125; The internet version can be read at: http://answering-islam.org/Books/Bell/hanifs.htm

[২] আমরা প্রবন্ধে জায়েদ ইবনে আমর বিন- নওফলকে সংক্ষেপে জায়েদ বিন আমর নামেই অভিহিত করব।

প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। 'হানিফি' গোষ্ঠীর সদস্য হলেন মক্কায় জন্মগ্রহণকারী ওবায়দুল্লাহ বিন জাহাশ এবং উসমান বিন আল-হুয়ায়রিথ প্রমুখ। উল্লেখ্য, এঁদের মধ্যে ওয়ারাকা বিন নওফল প্রফেট মুহম্মদের প্রথম স্ত্রী বিবি খাদিজার চাচাতো ভাই ও নবী মুহাম্মদের (দঃ) 'ইসলাম-প্রচারের' ধর্মগুরু; জানা যায়, তিনি খাদিজা ও মুহাম্মদের (দঃ) বিয়ের ঘটকও ছিলেন। খলিফা ওমরের চাচা জায়েদ ইবনে আমর আরবের পৌত্তলিক ধর্মাবলম্বী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, পরবর্তীতে তিনি এই পৌত্তলিক ধর্মমত ত্যাগ করে একেশ্বরবাদের চর্চার অংশ হিসেবে 'আব্রাহামিয় মতবাদ' গ্রহণ করেন। জায়েদ ইবনে আমর তাঁর গোত্রের পৌত্তলিকতা, মূর্তি পূজা, নারী-শিশু হত্যাকে ঘৃণা করতেন। সারা রমজান ধরেই তিনি মক্কার 'হেরা' নামক পাথরের পাহাড়ের গুহায় উপাসনা করতেন, যা পরবর্তীতে আমাদের নবী মুহাম্মদেরও উপাসনার নির্দিষ্ট স্থান হয়ে দাঁড়ায়। এমন কী হাদিস থেকে জানা যায়, (৫৯৫ খ্রিস্টাব্দের দিকে) নবী মুহাম্মদ (দঃ) যখন পৌত্তলিক দেব-দেবীর উপাসনা করতেন, কোরবানি দেওয়া মাংস রান্না করে জায়েদের জন্য নিয়ে যেতেন তার সাথে খাওয়ার জন্য তখন এই জায়েদ বিন আমরই মুহাম্মদকে তিরষ্কার করতেন এবং পৌত্তলিকতা থেকে বিরত থেকে একেশ্বরবাদ চর্চার পরামর্শ দিতেন। (দ্রষ্টব্য : বোখারি শরিফ, ভলিউম ৭, বুক ৬৭, নম্বর ৪০৭)। হানিফ দল এক সময় মক্কার প্রভাবশালী 'পৌত্তলিক ধর্মে'র ওপর প্রকাশ্যে অনাস্থা ঘোষণা করে বসে। ফলে কোরায়েশ বংশের রোষে পড়ে তাদের অনেককেই দেশান্তরী হতে হয়। ওবায়দুল্লাহ বিন জাহাশ প্রাণ বাঁচাতে পার্শ্ববর্তী খ্রিস্টান রাজ্য আবিসিনিয়ায় (বর্তমানে ইথিওপিয়া) পালিয়ে যান এবং সেখানে খ্রিস্টান ধর্মমত গ্রহণ করেন; তাঁর স্ত্রী উম্মে হাবিবাকে (উমাইয়া গোত্র নেতা আবু সুফিয়ানের কন্যা, নবী মুহাম্মদ (দঃ) তাকে পরবর্তীতে বিয়ে করেন)। এবং উসমান বিন আল-হুয়ায়রিথও কোরায়েশদের হাত থেকে প্রাণ বাঁচাতে বাইজেন্টাইন রাজ্যে গমন করেন; তিনিও সেখানে খ্রিস্টান ধর্মমত গ্রহণ করেন। ওয়ারাকা বিন- নওফল ও জায়েদ বিন-আমর ছিলেন মুহাম্মদের (দঃ) অতি প্রিয়ভাজন। এই দুই ব্যক্তিই ছিলেন পরবর্তীতে মুহাম্মদের (দঃ) নতুন ধর্ম 'ইসলাম' আবিষ্কারের প্রথম ও প্রধান সহায়ক। ওয়ারাকা বিন-নোফেল ইহুদি-খ্রিস্টানদের ধর্মপুস্তক তৌরাত, জবুর ও ইঞ্জিল কেতাবে বিশেষজ্ঞ এবং তিনি হিব্রু থেকে আরবি ভাষায় খ্রিস্টানদের গসপেল (ইঞ্জিল কেতাব) অনুবাদ করেছেন (দ্রষ্টব্য : বোখারি শরিফ, ভলিউম ৬, বুক ৬০, নম্বর ৪৭৮ এবং বোখারি শরিফ, ভলিউম ১, বুক ১, নম্বর ৩) আর জায়েদ ইবনে আমর ছিলেন মূলত একজন কবি ও সাহিত্যিক। কোরানের অনেক কাব্যিক রূপ, ছন্দ ও শব্দচয়ন জায়েদ ইবনে আমরের কাছ থেকে অনেকাংশেই ধারকৃত[৩]। হানিফ সম্পর্কে ইসলাম বিশেষজ্ঞ Aloys Sprenger-এর মত হচ্ছে : 'Islam is the fruit of Hanif Tradition.' মুহাম্মদ (দঃ) যদিও জন্মের পর থেকেই পিতৃমাত স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন, লালন-পালন হয়েছিলেন দাদা-চাচার কাছে কিন্তু তিনি 'নিরক্ষর' ছিলেন, এ বিষয় নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। (প্রথম অধ্যায়ের 'মুহম্মদ (দঃ) কি নিরক্ষর ছিলেন?' অংশ দ্রষ্টব্য)। চাচা আবু তালিবের সাথে ব্যবসা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে প্রায়ই সিরিয়াসহ বিভিন্ন দেশে ভ্রমণের সাথী হতেন, এবং ব্যবসার হিসাব-নিকাশের পূর্ণ দক্ষতার কারণেই বিত্তশালী খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী খাদিজা মুহাম্মদের (দঃ) প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ৬১০ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ (দঃ) তাঁর নতুন ধর্ম 'ইসলাম' প্রকাশ্যে ঘোষণা দেন। মক্কা নগরীতে আগুন জ্বলে উঠলো। হাশিমি বংশোদ্ভূত মুহাম্মদের (দঃ) এই নতুন ধর্ম ঘোষণায় অপমানবোধ করলো উমাইয়া দল, আর মুহাম্মদের (দঃ) স্বীয় গোত্রের লোকজন পৌত্তলিকতার অবসানের দুশ্চিন্তায়, দেব-দেবীর কল্যাণে কাবা গৃহ থেকে বিপুল আয়ের পথ বন্ধ হওয়ার আশঙ্কায় হলো উৎকণ্ঠিত। এদিকে হজরত উসমান (রাঃ) চাচা হাকামের সহযোগিতায় ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রচুর উন্নতি করার ফলে দেশ-বিদেশে সুপরিচিতি লাভ করেন। ব্যবসার সূত্র ধরেই একদিন মক্কার ব্যবসায়ী আবু বকরের (রাঃ) সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়।

হজরত উসমান (রাঃ) ছিলেন আবেগপ্রবণ, কিছুটা সরল প্রকৃতির সুদর্শন যুবক। ধনে-মানে উসমান (রাঃ) সুখী হলেও মনে-প্রাণে সুখ ছিল না। পিতা আফ্ফানের মৃত্যুর পর তাঁর মাতা উর্দি (ওরয়া) যে লোকটিকে বিয়ে করেন, উসমান তাকে সহ্য করতে পারতেন না। মনের দুঃখে একদিন ঘর ছেড়ে মক্কায় চলে আসেন। উসমান প্রফেট মুহাম্মদের প্রথম কন্যা রোকেয়াকে ভালোবাসতেন এবং মনে-মনে তাঁকে বিয়ে করার ইচ্ছে পোষণ করতেন। কিন্তু যখন একদিন শুনতে পেলেন রোকেয়ার বিয়ে অন্যত্র হয়ে গেছে, উসমান (রাঃ) খুবই দুঃখ পেলেন। একদিন সেই দুঃখ মোচনের সুবর্ণ সুযোগটি সৃষ্টি করে দিলেন তাঁর নব্য ব্যবসায়ী বন্ধু আবু বকর (রাঃ)। মুহাম্মদ (দঃ) তাঁর নতুন ধর্ম 'ইসলাম' ঘোষণার পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রথমেই চল্লিশ বছর বয়স্কা, দু'বার বিবাহিতা, বিপুল সম্পদের অধিকারিণী খাদিজাকে বিয়ে করেন। মুহাম্মদ (দঃ) ভালোভাবেই জানতেন, বাহুবল ও অর্থবল ছাড়া তাঁর নতুন ধর্ম 'সূতিকা ঘরে'ই মারা যাবে; যেমনটা হয়েছে হানিফদের অবস্থা। তাই আপন কন্যাদ্বয়কে আপন চাচার সন্তান ওত্‌বা এবং ওতাইবা ইবনে আবু লাহাব নামের দুই অমুসলিম সহোদর ভাইয়ের সাথে বিয়ে দেন। উম্মে কলসুম বিবাহকালে অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন। নবী কন্যাদ্বয়ের বিবাহ ইসলামের শরিয়ত মোতাবেক অবশ্যই ছিল না; কারণ আবু লাহাব বা তার দুই পুত্র ইসলাম ধর্মাবলম্বী ছিলেন না, এমন কী এই ধর্মকে তারা মেনে নিতে পারেননি, তাদের আশঙ্কা ছিল এটি (ইসলাম) তাদের পূর্বপুরুষের ধর্মের প্রতি হুমকিস্বরূপ। তাই ওত্‌বা

[৩] এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পাঠ করুন : Abul Kasem, *Who Authored the Qur'an?—an Enquiry*, http://www.mukto-mona.com/Articles/kasem/quran_origin.htm

এবং ওতাইবা মুহাম্মদের (দঃ) নতুন ধর্মের সংবাদ শুনে নবীজির প্রতি তাদের তীব্র অনাস্থাই শুধু প্রকাশ করলো না উপরন্তু তাঁর কন্যাদ্বয়কে তালাক দিয়ে ঘর থেকে বের করে দিল। প্রফেট মুহাম্মদ (দঃ) অন্তরে খুবই দুঃখ পেলেন কিন্তু কিছু করার শক্তি ছিল না, শুধু অভিশাপ দেওয়া ছাড়া। ('সুরা লাহাব' দ্রষ্টব্য)। রোকেয়াকে নিয়ে উসমানের (রাঃ) মনের গোপন বাসনা আবু বকর (রাঃ) জানতেন এবং নবী কন্যাদ্বয়ের তালাক হয়ে যাওয়ার সুবাদে 'উসমানের বাসনার' সংবাদটা তিনি (আবু বকর) মুহাম্মদের (দঃ) কানে পৌঁছালেন। নবী মুহাম্মদও এই ধরনের সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। বাহুবল অর্জনের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে কিন্তু এবারে অর্থবলের সুযোগটা হাতছাড়া করা যায় না। মুহাম্মদ (দঃ) উসমানকে নবপ্রচারিত ইসলাম ধর্ম গ্রহণের শর্ত মেনে নিলে মেয়ের বিয়ে দিতে রাজি হলেন। উসমানও খুশি মনে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে রোকেয়ার সাথে প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ হলেন। আরবের একটি ধনাঢ্য-সম্ভ্রান্ত পরিবারে, 'সোনার চামচ' মুখে নিয়ে যে উসমানের জন্ম, সেই উসমান এমন কাণ্ড করে বসবেন উমাইয়া বংশের কেউ কোনোদিন কল্পনাও করতে পারেনি। চাচা হাকামের, ঢাক-ঢোল বাজিয়ে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় উসমানের বিয়ে দেওয়ার সকল স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। নববধূকে নিয়ে তায়েফের রাজপ্রাসাদে উসমানের আর যাওয়া হলো না। কিছুদিন পরেই তিরস্কার আর অপমানের বোঝা মাথায় নিয়ে মক্কা থেকে বিতাড়িত অনেক নব্য মুসলিম দলের সাথে নববধূকে নিয়ে উসমান পার্শ্ববর্তী খ্রিস্টান রাষ্ট্র আবিসিনিয়ায় গমন করেন। দরিদ্র দেশ আবিসিনিয়ায় উসমান ব্যবসা-বাণিজ্যের অনেক চেষ্টা করেও তেমন সুবিধা করতে পারলেন না। আবিসিনিয়ায় প্রায় পাঁচ-ছয় বছর সীমাহীন দুঃখ-কষ্টের মধ্যে অবস্থানকালে, ৬১৯ খ্রিস্টাব্দে, একদিন রোকেয়ার কাছে খবর আসলো, এককালের আরবের স্বনামধন্য মহিলা, অফুরন্ত ঐশ্বর্যের অধিকারিণী, মা জননী খাদিজা রোগাক্রান্ত হয়ে, ঔষধ-পথ্যবিহীন অবস্থায় মারা গেছেন। মাতৃশোকে রোকেয়ার শুধু মনই ভাঙেনি, তাঁর দেহও ভেঙে যায়; তিনি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। ৬২২ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে মুহাম্মদ কোরায়েশ কর্তৃক তাঁর প্রাণনাশের আশঙ্কায় রাতের অন্ধকারে বিশ্বস্ত সহযোগী আবু বকরকে সঙ্গে নিয়ে মদিনাভিমুখে পালিয়ে যান। ইসলামের ইতিহাসে এই ঘটনাকে 'হিজরত' বলা হয় এবং ঐ দিন থেকে পরবর্তীতে হিজরিসন গণনা শুরু করা হয়।[৪] তখন মুহাম্মদের (দঃ) বয়স ছিল তিপ্পান্ন আর তাঁর প্রচারিত ধর্মের চলছিল তেরো বছর। মদিনায় এসেই মুহাম্মদ (দঃ) তাঁর এতোদিনকার বৈরাগী লেবাসের অন্তরালে লুকায়িত রাজনৈতিক ইসলাম প্রকাশের প্রস্তুতি নেন। এক হাতে তসবিহ্ আর এক হাতে তলোয়ার!

(২)

হযরত উসমান হিজরি দুই সনে (৬২৪ খ্রিস্টাব্দে) আবিসিনিয়া থেকে স্বস্ত্রীক মদিনার পথে যাত্রা করেন। পীড়িত, ক্ষীণ স্বাস্থ্যের রোকেয়া তখন গর্ভবতী। পথিমধ্যে তাঁদের একটি পুত্র সন্তান জন্ম নেয় কিন্তু সে শৈশবেই মারা যায়। রোকেয়ার স্বাস্থ্যের অবস্থা দিন-দিন শোচনীয় হতে থাকে। কিছুদিন পর রোকেয়া যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত, নবী মুহাম্মদ (দঃ) তখন তাঁর তের বছরের তৈরি তিনশতো তেরোজন অনুসারী সৈনিক নিয়ে, মদিনা থেকে প্রায় ষাট মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে বদর প্রান্তে যুদ্ধরত। মুহাম্মদ (দঃ) সিরিয়া থেকে মক্কাভিমুখী একদল কোরায়েশ বণিকের (আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে) পথ রুখে দাঁড়ান[৫]। যুদ্ধের জন্য মুসলমানগণ পূর্ব থেকেই প্রস্তুত ছিলেন। হঠাৎ আক্রমণে বণিকদল হতভম্ব হয়ে যায়। বাহক মারফত মক্কার কোরায়েশগণ জানতে পারলো যুদ্ধ ব্যতীত বণিকদলকে প্রফেট বাহিনীর হাত থেকে উদ্ধার করা সম্ভব নয়। বদর প্রান্তে সংঘটিত হলো ইসলামের ইতিহাসের 'সর্বপ্রথম' যুদ্ধ[৬]।

---

[৪] প্রফেট মুহাম্মদের মৃত্যুর ছ'বছর পরে ৬৩৮ সালে দ্বিতীয় খলিফা ওমর গ্রিক ও রোমানদের জীবনযাত্রা বিবেচনা করে, হিজরতের তারিখ থেকে মুসলিম যুগ 'হিজরি সাল' প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত করেন। এই যুগ বা বর্ষ শুরু করার নির্ধারিত দিনটি হয় যে চান্দ্র মাসে হিজরত হয়েছিল ঐ মাসের প্রথম তারিখ থেকে। ৬২২ খ্রিস্টাব্দের রবিউল (জুলাই) মাসের ১৫/১৬ তারিখে মুহাম্মদ মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেছিলেন। আরববাসীর চান্দ্র বছর ব্যবহার করার যে সীমাবদ্ধতা রয়েছে তা হলো ৩৩টি সৌর বছরে চান্দ্র বছর হবে ৩৪টি। এখন অবশ্য আন্তর্জাতিক সুবিধার জন্য প্রায় সব মুসলিম দেশ গ্রেগরিয়ান সৌর ক্যালেন্ডারের সাথে মিলিয়ে অনুসরণ করে থাকেন। (দ্রষ্টব্য : বেঞ্জামিন ওয়াকার (সা'দ উল্লাহ্ অনূদিত), *ফাউন্ডেশন অব ইসলাম*, সময় প্রকাশনী, ২০০৫, পৃষ্ঠা ১২৩। এবং স্যর সৈয়দ আমীর আলী, *এ শর্ট হিস্ট্রি অব স্যারাসিনস*, মল্লিক ব্রাদার্স, কলিকাতা, (প্রথম প্রকাশ ১৯৯২), ২০০৫, পৃষ্ঠা ১০)।

[৫] এ প্রসঙ্গে মুহম্মদের প্রথম জীবনীকার ইবনে ইসহাক বদরের যুদ্ধের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে বলেন (পৃঃ ২৮৯), 'when the apostle heard about Abu Sufyan returning from Syria, he summoned the Muslims and said, 'This is the Quraysh caravan containing their property. *Go out to attack it, perhaps God will give it as a prey.*'

[৬] ইসলামের বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তকগুলোতে বদরের যুদ্ধকে ইসলামের ইতিহাসে 'সর্বপ্রথম' যুদ্ধ বলা হলেও মহানবী (দঃ) বদরের 'যুদ্ধের' আগেও শত্রুপক্ষের উপর বিভিন্ন চোরাগোপ্তা হামলা (আরবীতে বলে গাজওয়া) চালিয়েছিলেন। প্রথম হামলাটি তিনি করেছিলেন ৬২৩ খ্রীস্টাব্দে মদীনায় হিজরতের নয় মাসের মাথায় এক কোরায়েশ কাফেলার উপর। তবে হামলাটির নেতৃত্বে মুহম্মদ ছিলেন না, নেতৃত্বে ছিলেন মুহম্মদের চাচা আব্দুল মুত্তালিব। হামলার উদ্দেশ্য ছিলো নেহাতই ধন সম্পদ লুটপাট। কিন্তু সেই হামলা সফল হয় নি। পরবর্তী কয় মাসে মুহম্মদ আরো কিছু হামলা পরিচালনা করেন; এর মধ্যে বোয়াতের হামলা, কাহারের হামলা, ওয়াদ্দানের হামলা, সাফওয়ানের হামলা, নাখালার হামলা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

মুসলমানদের পক্ষে স্বয়ং মুহাম্মদ মুহাম্মদ (দঃ) সেনাপতির দায়িত্বে। বদর প্রান্তর সত্তরটি তাজা প্রাণের রক্তে রঞ্জিত হলো। আর এই রক্তের মাঝে খোঁজে পেল কিশোর ইসলাম বেঁচে থাকার, বিকশিত হওয়ার অপূর্ব স্বাদ। উসমান (রাঃ) সে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। সেনাপতি মুহাম্মদ (দঃ) সত্তরজন মানুষকে খুন ও ততোধিক মানুষকে বন্দী করে যুদ্ধে জয় লাভ করেন। বিজয়ীর বেশে গর্বিত সৈন্যদল নিয়ে মুহাম্মদ (দঃ) যখন মদিনায় গৃহে ফিরলেন, রোকেয়া তখন এই পৃথিবীতে আর নেই। রোকেয়ার দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করতে হলো, বিজয় উৎসব করা নবীজি মুহাম্মদের (দঃ) আর হলো না। কিন্তু এই যুদ্ধে তাঁর পূর্ব-পরিকল্পনা (সম্পদ ও ক্ষমতা বিস্তার) বাস্তবায়নের পথে উৎসাহ ও আশা সঞ্চারিত হলো। মুহাম্মদ (দঃ) অতিসত্তর আরেকটি যুদ্ধের আয়োজনে মনোনিবেশ করলেন। আর পত্নী বিয়োগে শোকাহত উসমান (রাঃ) কিছুদিন পরেই পুরোদমে ব্যবসা বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করলেন। ব্যবসায় সুপরিচিত উসমান (রাঃ) পূর্ব অভিজ্ঞতায় রাতারাতি প্রচুর উন্নতি করলেন। এতোদিনে, কিশোর বয়সে তালাক প্রাপ্ত মুহাম্মদের (দঃ) দ্বিতীয় কন্যা উম্মে-কলসুম পূর্ণ যুবতী। উসমান (রাঃ) কলসুমের প্রেমে পড়লেন। নবীজির কাছে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। ধনে-মানে, রূপে-গুণে অতুলনীয় উসমানের (রাঃ) প্রস্তাব সাদরে গৃহীত হলো। নবী মুহাম্মদের (দঃ) দুই কন্যার পাণি গ্রহণের কারণে উসমান (রাঃ) 'যিন্নুরাইন' অর্থাৎ যুগল নূরের অধিকারী উপাধি পেলেন।

প্রথম যুদ্ধের মাত্র এক বছর পরেই, হিজরি তৃতীয় সনে (৬২৫ খ্রীস্টাব্দ), মদিনা থেকে ছয় মাইল উত্তর-পূর্বে ওহুদ প্রান্তরে কোরায়েশদের সাথে মুহাম্মদের (দঃ) দ্বিতীয় যুদ্ধ হয়। তারপর ৬২৭ খ্রীস্টাব্দে আহজাবের (খন্দকের)যুদ্ধ। ইসলামের এই প্রাথমিক যুদ্ধগুলোতে মুসলমানেরা আর্থিক দিক দিয়ে তেমন সুবিধা করতে না পারলেও বদরের যুদ্ধের পর পরই মুহম্মদ বনি কুয়ানুকা গোত্রের উপর আক্রমণ চালিয়ে তাদের বাস্তুচ্যুত করেন। আর ওহুদের পর আক্রমণ করেন বনি নাদিরের ইহুদী ট্রাইবকে। তখন আব্দুলাহ বিন উবেহ্‌র জোরজবরদস্তির কারণে বড় ধরণের রক্তপাত এড়ানো গেলেও ৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে আব্দুলাহ বিন উবেহ্‌কে এড়িয়ে গিয়ে মহানবী বনি কুরাইজার ইহুদী গোত্রের উপর যে নৃশংসতা চালান তা ইতিহাসে সত্যই বিরল। ৮০০ থেকে ৯০০ আত্মসমর্পণকারী বন্দিকে পিছমোড়া করে বেঁধে জবাই করে হত্যা করা হয়। মুহম্মদ (দঃ) নিজেও এই তান্ডবলীলায় প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিয়ে দু'জন ইহুদী নেতার শিরোচ্ছেদ করেন। বনি কুরাইজার ত্রাসের পর ৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে আক্রমণ করেন খাইবারের আরেকটি ইহুদী গোত্রকে। এই 'যুদ্ধ'গুলোতে শিশু ইসলাম শুধু রক্তই পান করলো না, যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদের অমৃতস্বাদও গ্রহণ করলো। যুদ্ধে বিজয়ী মুসলমানগণ প্রচুর সম্পদ লাভ করলেন এবং শত্রুপক্ষের অনেক শিশু-কিশোর, নর-নারীকে বন্দী করতে সক্ষম হলেন। মুসলমানগণ বুঝতে পারলেন, 'যুদ্ধ এবং লুণ্ঠন একটি অকল্পনীয় লাভজনক ব্যবসা'। কোরায়শগণ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে গেলো। ইসলাম ত্রাসের সৃষ্টি করলো সারা আরববিশ্বে। ষষ্ঠ হিজরিতে মুহাম্মদ (দঃ) বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে বনি-মুত্তালিক গোত্রের ইহুদিদেরকে আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধে ইহুদিগণ মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাদের বহু নারী মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়ে যায়। নিজ শহরের বাইরে রাতের অন্ধকারে অতর্কিত আক্রমণ 'আত্মরক্ষামূলক' হয় না।

মুহম্মদ (দঃ) এর যুদ্ধগুলো কি আদপেই আত্মরক্ষামূলক ছিলো?

মুসলিমদের মধ্যে প্রচলিত একটি বিশ্বাস হল, মহানবী মুহম্মদ (দঃ) তার জীবনে যে সমস্ত যুদ্ধ সম্পন্ন করেছেন, তার বেশিরভাগই বোধ হয় আত্মরক্ষামূলক ছিলো। তারা ভাবেন, মক্কার কাফেররা মুহম্মদকে মারার জন্য সব সময় মুখিয়ে থাকত, তাদের হাত থেকে রক্ষা পেতেই বোধ হয় তাকে বাধ্য হয়ে মাঝে সাঝে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হত। কিন্তু এ ব্যাপারটি একদমই সত্য নয়। মুহাম্মদ কর্তৃক বেশিরভাগ যুদ্ধই ছিল আসলে 'অফেন্সিভ'।[৭] বনি-মুত্তালিক গোত্র বা সিরিয়া থেকে বাণিজ্য করে বাড়ি ফেরার পথে কোরায়েশ বণিকদল মদিনা আক্রমণ করে নাই। নবীজি যে রাতের আঁধারে সৈন্যদল মরুযাত্রী উটের কাফেলায় 'অফেন্সিভ' আক্রমণ চালাতেন, তার প্রমাণ রয়ে গেছে অনেক হাদিসে। এমন একটি হাদিস পাঠকের সুবিধার্থে দেওয়া হল :

সে হিসেবে বদরের যুদ্ধ ইসলামের অষ্টম কিংবা নবম যুদ্ধ। ওয়াদ্দানের যুদ্ধ থেকে মহানবী সরাসরি সেনাপতি হিসেবে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। পাঠকেরা এ প্রসঙ্গে Sir Willam Muir এর A Life of Mahomet and History of Islam to the Era of the Hegira বইটি দেখতে পারেন। এ ছাড়া মুক্তমনায় আবুল কাশেমের 'The Root of Terrorism a la Islamic style ' প্রবন্ধটিতেও বদরের যুদ্ধের আগে ঘটা আরো আটটি হানা-যুদ্ধের বর্ণনা পাওয়া যাবে।

[৭] আল তাবারির বর্ণনা থেকে দেখা যায়, নবী মুহাম্মদ (দঃ) তাঁর জীবনে প্রায় ষাটটির মতো যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন; এর মধ্যে উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধ ছাড়া সবগুলোই ছিল আক্রমণাত্মক (incursion)।

'Ibn 'Aun reported: I wrote to Nafi' inquiring from him whether it was necessary to extend (to the disbelievers) an invitation to accept (Islam) before meeting them in fight. He wrote (in reply) to me that it was necessary in the early days of Islam. **The Messenger of Allah (may peace be upon him) made a raid upon Banu Mustaliq while they were unaware and their cattle were having a drink at the water.** He killed those who fought and imprisoned others. On that very day, he captured Juwairiya bint al-Harith. Nafi' said that this tradition was related to him by Abdullah b. Umar who (himself) was among the raiding troops." (দ্রষ্টব্য : মুসলিম শরিফ, চ্যাপ্টার ১, বুক ১৯, নম্বর ৪২৯২)[৮] ।

এমন কি তিনি শিশু এবং নারীদেরও রেহাই দিতেন না -

It is reported on the authority of Sa'b b. Jaththama that the Prophet of Allâh (may peace be upon him), when asked about the women and children of the polytheists being killed during the night raid, said: They are from them.[belong to them][৯]

কোরানে বলা আছে্ 'তোমাদের দক্ষিন হস্ত যাদের অধিকারী (দাস, দাসী এবং যুদ্ধবন্দিনী)- আলাহ তোমাদের জন্যে তাদেরকে বৈধ করেছেন" (৪:২৪) । এই আয়াতের ব্যখ্যায় জালালান বলেন- "অর্থাৎ, যাদেরকে তারা যুদ্ধের ময়দানে আটক করেছে, তাদের সাথে সহবাস করা তাদের জন্যে বৈধ, যদি তাদের স্বামীগণ জীবিতও থাকে" । এই সুরার বাস্তব প্রতিফলন আমরা দেখি মহানবীরর বিভিন্ন যুদ্ধের দলিলে । কিভাবে যুদ্ধবন্দীদের ভাগাভাগি করা হত তার বর্ননা বিভিন্ন হাদিসে পাওয়া যায় (যেমন, সহি বুখারিঃ ভলিউম-৫, বুক নং-৫৯, হাদিস নং-৬৩৭দ্রঃ) । বানু কুরাইজা নামক ইহুদি গোত্রটির সমস্ত পুরুষ সদস্যদের হত্যা করার পর তাদের ধনসম্পত্তি ও নারীগন মুসলমানদের দখলে আসে । ইবনে ইসহাকের বর্ণনা হতে আমরা জানতে পারি, মুসলমানগণ যখন বানু হাওয়াজিন গোত্রকে পরাজিত করে, প্রায় ৬ হাজার নারী ও শিশু বন্দী হয় মুসলমানদের হাতে । নারীদেরকে জিহাদিদের মধ্যে যথারীতি বন্টন করে দেয়া হয় । রায়হানা নামের এক সুন্দরী ইহুদিনীকে নবী নিজের জন্যে নির্বাচিত করেন । রায়তা নামের সুন্দরী বন্দিনীটি হযরত আলীর ভাগে পড়ে, জয়নাব নামের আরেক যুদ্ধবন্দী নারী পড়ে হযরত ওসমানের ভাগে । নারী-মাংসের এক ভাগ হযরত ওমরের ভাগ্যেও জুটেছিল, তবে ভাগটি তিনি নিজে না নিয়ে ভোগ করার জন্যে তা প্রিয় পুত্র আব্দুল্লাহর হাতে তুলে দেন বলে কথিত আছে । শুধু রায়হানা নয়, জাওয়াহিরা এবং সাফিয়া নামের আরও দুই রক্ষিতা ছিল নবীর । জওয়াহিরা তার হাতে আসে বানু আল-মুস্তালিক অভিযান থেকে, সাফিয়া আসে খায়বারের বানু নাজির গোত্রের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযান থেকে । এমনকি যুদ্ধজয়ের পর স্বামীর সামনে স্ত্রীকে বলৎকার করার নির্দেশ দিতেও মহানবী কুন্ঠিত হন নি । সুনান আবু দাউদঃ বুক নং-১১, হাদিস নং-২১৫০:

আবু সাইদ আল খুদরি বলেন- "হুনায়েন যুদ্ধের সময় আল্লাহর রাসুল (দঃ) আওতাসে এক অভিযান পাঠান । তাদের সাথে শত্র"দের মোকাবেলা হলো এবং যুদ্ধ হলো । তারা তাদের পরাজিত করল এবং বন্দী করল । রাসুলুল্লাহর (দঃ) কয়েকজন অনুচর বন্দিনীদের স্বামীদের সামনে তাদের সাথে যৌনসঙ্গম করতে অপছন্দ করলেন । তারা (স্বামীরা) ছিল অবিশ্বাসী কাফের) । সুতরাং মহান আল্লাহ কোরাণের আয়াত নাজেল করলেন- "সমস্ত বিবাহিত স্ত্রীগণ (তোমাদের জন্যে অবৈধ); কিন্তু তোমাদের দক্ষিন হস্ত যাদের অধিকারী (যুদ্ধবন্দিনী)- আল্লাহ তোমাদের জন্যে তাদেরকে বৈধ করেছেন" ।

[৮] Also see: Sahih Bukhari, Vol. 3. Book 46, Number 717;
[৯] Sahih Muslim Book 019, Number 4321, 4322 and 4323.

এবারে (৬২৮ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে) মুহাম্মদ (দঃ) কোরায়েশদের মন-মানসিকতা ও শক্তি পরীক্ষার লক্ষ্যে চৌদ্দ শত সৈন্যসামন্ত নিয়ে মক্কা নগরী দখলের আয়োজন করলেন। মক্কা শহর থেকে সাত মাইল দূরে হোদায়বিয়ার উপত্যকায় এসে তারা আর অগ্রসর হলেন না। অনেক দেরিতে হলেও মক্কাবাসী দেখতে পেলো 'সন্ন্যাসী-বৈরাগী' লেবাসের ভেতরে লুকায়িত নবী মুহাম্মদের রাজনৈতিক চেহারা। এক সাথে চৌদ্দশত সৈন্য নিয়ে মুহাম্মদের (দঃ) আগমন সংবাদ পেয়ে কোরায়েশগণ আগে থেকেই সর্বাত্মক যুদ্ধের প্রস্তুতি নিলেন। মহানবী তার দলবল নিয়ে মক্কাভিমুখে 'হুদায়বিয়া' নামক স্থানে এসে তাবু গাড়লেন আর মুহাম্মদের (দঃ) বার্তা-বাহক হয়ে হযরত উসমান কোরায়েশ নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করে বললেন যে, তাঁরা যুদ্ধ করতে আসেননি, এসেছেন কাবা ঘর দর্শন করতে। মুহম্মদ (দঃ) কৌশলে কোরায়েশদের এক ধরনের ভুল ধারণা দিতে চাইলেও তার মূল উদ্দেশ্য যে আসলে ছিলো মক্কা দখল, তা মুহম্মদের প্রথম জীবনিকার ইবনে ইসহাকের ভাস্য থেকে স্পষ্ট হয়[১০] -

> 'The apostle's companions had gone out without any doubt of occupying Mecca because of the vision which the apostle had seen, and when they saw the negotiations for peace and a withdrawal going on and what the apostle had taken on himself, they felt depressed almost to the point of death.'

এদিকে হজরত উসমানের ফিরতে দেরী হচ্ছিলো। এর মধ্যে মহানবীর তাবুতে গুজব ছড়িয়ে পড়লো যে উসমানকে কোরায়েশরা মক্কায় বন্দী করেছেন। খবর পেয়ে মুসলমানগণ ক্ষেপে উঠলেন। আকাশিয়া বৃক্ষের নিচে নবীজির হাতে হাত রেখে মৃত্যু-শপথ নিলেন, মক্কা জয় না করে তারা ফিরে যাবেন না; ইসলামের ইতিহাসে এই শপথ 'বায়াতে রেদওয়ান' নামে অভিহিত। (দ্রষ্টব্য : সুরা ৪৮, ফাত্হ্, আয়াত ৪৮)। এর মধ্যেই উসমান ফিরে আসলেন এবং হজ (দেব-দেবী দর্শন) উপলক্ষে বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত কতিপয় উপজাতীয় নেতাদের হস্তক্ষেপে আপাতত দুইপক্ষ মারাত্মক বিপর্যয় থেকে রক্ষা পেল। তারা উভয়পক্ষের মধ্যে একটি সন্ধি স্থাপন করতে সক্ষম হলেন, যা ঐতিহাসিক 'হোদাইবিয়া সন্ধি' নামে পরিচিত। আরব বিশ্বে মুহাম্মদের (দঃ) নেতৃত্বে একচেটিয়া ক্ষমতার অধিকারী অপ্রতিরুদ্ধ এক বিরাট মুসলিম বাহিনী গড়ে উঠলো। শেষ পর্যন্ত তারা বিনা যুদ্ধে ৬৩০ খ্রিস্টাব্দের ১১ জানুয়ারি তারিখে দশ হাজার সৈন্য নিয়ে এসে মক্কা নগরী দখল করে নেন। বদর থেকে তাবুকের যুদ্ধ পর্যন্ত দশ বছরের মধ্যে কমপক্ষে নয়টি যুদ্ধে মুহাম্মদ (দঃ) সেনাপতির দায়িত্বে ছিলেন। ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে আরাফাতের ময়দানে তিনি তাঁর শেষ ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। এই ভাষণের দুই মাস পরেই ৬৩ বছর বয়সে রসুল মুহাম্মদ (দঃ) ইহলোক ত্যাগ করেন। উল্লেখ্য, তখন আবু-বকর তনয়া, নবীজির প্রিয় পত্নী আয়েশার বয়স আঠারো।

(৩)

মুহাম্মদের (দঃ) মৃত্যুর পরপরই অগণতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতা দখল করে বসেন মুহাম্মদের সর্বকনিষ্ঠ এবং প্রিয় পত্নী আয়েশার পিতা হজরত আবু বকর (রাঃ)। ক্ষমতার মোহে 'মক্কা থেকে পালিয়ে এসে মদিনায় আসন গেড়ে বসা' কোরায়েশ নেতাগণ মদিনার আনসারিদের কথা ভুলে গেলেন। মদিনাবাসীর কোনো দাবি ও প্রতিবাদ তারা কানেই তুললেন না। মদিনার মুসলমান নেতা হজরত সাদ (রাঃ) পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন, খলিফা নির্বাচিত হবে মদিনার আনসারিদের ভেতর থেকে। মদিনাবাসী শেষ পর্যন্ত মক্কার একজন এবং মদিনার একজন করে দুই খলিফা মেনে নিতে রাজি হলেন। তাদের এ দাবিও প্রত্যাখ্যান করা হলো। মদিনার ঘরে-বাইরে হিংসার আগুন জ্বলে উঠলো। হজরত আলি (রাঃ) ও মুহাম্মদের (দঃ) কনিষ্ঠ কন্যা হজরত ফাতিমা (রাঃ) নবনির্বাচিত আবু বকরকে (রাঃ) প্রথম থেকেই খলিফা হিসেবে মেনে নিতে পারেননি। প্রফেটের মেয়ে ফাতিমা ও তাঁর চাচা আব্বাস মুহাম্মদের (দঃ) মালিকানা, মদিনা ও খায়বারে রক্ষিত কিছু সম্পত্তি দাবি করায় এ নিয়ে আবু বকরের সাথে তাদের মনোমালিন্য দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত প্রায় ছয় মাস পর বিভিন্ন সামাজিক দিক চিন্তা করে হযরত আলি (রাঃ) হযরত আবু বকরের (রাঃ) খেলাফত মেনে নেওয়ায় ঐ বিষয়টি চাপা পড়ে যায়।

আবু বকরের শাসনামলে, মুহাম্মদের (দঃ) সময়ের জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত মানুষগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করলো। বিভিন্ন রাজ্যের অমুসলিম সরকারগণ তাঁদের ওপর অন্যায়ভাবে আরোপিত এতোদিনের 'জিজিয়া' কর দিতে অস্বীকার করলো। আরবের চতুর্দিকে বিদ্রোহের

[১০] Ibn Ishaq, The Life of Muhammad, trs. A Guillaume, Oxford University Press, Karachi, 2004 imprint, p. 505

ঝাণ্ডা উড়তে দেখা গেল; অসন্তুষ্টি ও ধর্মত্যাগের হিড়িক লেগে গেল। মুহাম্মদের (দঃ) দশ বছরের সংঘাতময় অশান্তির জীবন থেকে মানুষ মুক্তি চাইলো। অনেক নব্য মুসলমান তাদের পূর্ববর্তী ধর্মে ফিরে গেলো। বাহরাইনের শক্তিশালী বনু-বকর গোত্রের লোকজন (যারা প্রাণ রক্ষার্থে মুহাম্মদের (দঃ) সময়ে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল) প্রকাশ্যে ইসলাম ত্যাগ করলো। কিছু ওম্মান বংশীয় লোকেরাও ইসলাম ধর্ম ছেড়ে দিল। পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে হযরত আবু বকর জনগণের ওপর স্বৈরাচারী স্টিমরোলার চালিয়ে দিলেন। সেনাপতির দায়িত্বে নিয়োগ করলেন দুধর্ষ সাহাবি খালিদ বিন ওয়ালিদকে। উল্লেখ্য, ৬২৯ খ্রিস্টাব্দের দিকে 'মুতা' যুদ্ধে নবীর জায়েদ ইবনে হারিথ নামের পালক পুত্র (ক্রীতদাস), হযরত আলির বড় ভাই জাফর, 'যোদ্ধা কবি' হিসেবে পরিচিত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা নিহত হয়েছিলেন; পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন খালিদ বিন ওয়ালিদের মতো যোদ্ধারা। এই পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে মুহাম্মদ (দঃ) নিজেই সিরিয়া আক্রমণের প্রস্তুতি নিয়েছিলেন তাঁর (মুহাম্মদের) মৃত্যুর কয়েক সপ্তাহ পূর্বে।

প্রথম খলিফা নির্বাচন কি কোন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ঘটেছিলো?

মুসলিমদের অনেকেই বিশ্বাস করেন যে, নবীজীর ওফাত-এর পর সর্বপ্রথমে হজরত আবুবকরকে খলিফা হিসাবে নির্বাচিত করে তার পরে বোধ হয় তারা নবীজীর শেষকৃত্য করেছিলেন। আমাদের দেশে ইসলামের ইতিহাসে তাই পড়ানো হয়, যদিও এর স্বপক্ষে নিভুরযোগ্য কোন সুত্র নেই। ইসলামের সঠিক ইতিহাস জানার জন্য মুহম্মদের প্রথমদিককার জীবনীকারদের বক্তব্যই অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য বলে গন্য করা হয়। কারণ তাদের বর্ণনা অতিরঞ্জন এবং বিকৃতিমুক্ত। মুহম্মদের প্রথম জীবনীকার হচ্ছেন ইবনে ইসহাক। তার বিখ্যাত গ্রন্থটির নাম ছিলো 'সিরাত-আল-নবী' বা সংক্ষেপে 'সিরাত'। এছাড়া, ইসলামের ইতিহাসের প্রেক্ষাপট পর্যালোচনায় সবচেয়ে প্রমান্য দলিল হিসেবে গন্য করা হয় ইবনে সাদের তাবাকাত, সহি বুখারি, এবং তারিখ আল্ তাবারি'র তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুককে। আমরা সে সমস্ত দলিল দস্তাবেজ পুঁজি করেই এগুবো। সহি বুখারি ৮ম খন্ড, হাদিস নং ৮১৭; সিরাত (পৃঃ ৬৮৪); এবং তারিখ আল তাবারির তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুককের রেফারেন্স থেকে পাওয়া বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি যে,

- খলিফা নির্বাচন মোটেই 'গণতান্ত্রিক' কোন প্রক্রিয়ায় হয়নি, বরং তুমুল হট্টগোলের মধ্যে হঠাৎ করেই হয়েছিল।
- জনগণ আগে থেকে মোটেও অবগত ছিলো না, এবং
- দশ জন আশারা মোবাশ্শারা-র মধ্যে ঘটনাক্রমে মাত্র চার জন উপস্থিত ছিলেন, বাকি ৬ জন এ সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না।

নবী (দঃ) এর মৃত্যুর পরেই যখন সবাই নবীজীর মৃতদেহ সৎকারের ব্যবস্থা করছিলেন, তখন ওমরের কাছে খবর এল যে আনসাররা বনু সাদ' গোত্রের চত্বরে একজোট হয়ে নেতা বানাবার কথাবার্তা বলছে। ওমর উদ্বিগ্ন হয়ে নবীর ছুটে বাসায় এসে আবুবকরকে নিয়ে ছুটলেন বনু সা'দ-এর চত্বরে। পথে আরো দু'জন আশারা মোবাশশারা'র সাথে দেখা হলে তাঁরাও সঙ্গে চললেন। তারপর বাকি ৬ জন আশারা মোবাশশারা ও বেশীর ভাগ সাহাবীর অনুপস্থিতিতে এবং জনগণকে আগে থেকে কিছুই না জানিয়ে মাত্র কিছু লোকের উপস্থিতিতে তুমুল গালাগালি ও ঝগড়ার মধ্যে হজরত ওমর একেবারে হঠাৎ আবুবকরকে খলিফা ঘোষণা করে দিলেন। এই ঘটনা উপস্থিত জনগনের মধ্যে নিদারুন ক্ষোভের সঞ্চার করেছিল যা মারামারি ধাক্কাধাক্কিতেও রূপ নেয় বলে বিবৃত আছে। এমনকি ওমরের দেয়া ভাষণেও এই আকস্মিক বা 'হঠাৎ করে' ঘটে যাওয়ার ইঙ্গিত স্পষ্ট। সহী বুখারির একটা দীর্ঘ হাদিসে (Volume 8, Book 82, Number 817) এর উল্লেখ পাওয়া যায়।

মুহাম্মদের (দঃ) সেই অসম্পূর্ণ কাজটি পূর্ণ করতে, আবু বকর (রাঃ) প্রথমেই আক্রমণ করলেন সিরিয়ার ওপর। ইরানের খসরু পারভেজ, যিনি একসময় প্রফেট মুহাম্মদকে বন্দী করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, আবু বকর (রাঃ) তাঁকেও শায়েস্তা করার লক্ষ্যে ইরান আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিলেন। অনেক মুসলমান নেতাগণ এই আক্রমণের বিরোধিতা করেছিলেন। আবু বকরের (রাঃ) নির্দেশে

খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ) বেপরোয়া হয়ে আরবের একের পর এক গোত্রের ওপর নৃশংস আক্রমণ চালাতে থাকেন। এক সাথে আবু বকরের (রাঃ) কমান্ডারগণ ছড়িয়ে পড়েন চতুর্দিকে; বাহরাইনে গেলেন আলা বিন হাদরামি, ইরানের দক্ষিণ সীমান্ত থেকে বাইজেনটাইন পর্যন্ত খালিদ বিন ওয়ালিদ ও ইরাকের উত্তর সীমান্তে আয়াজ বিন গানম। মাত্র দুই বছর তিন মাসের স্বৈরশাসনে আবু বকর গোটা আরবভূমিকে এক রণক্ষেত্রে পরিণত করেন। নিজেদের চৌদ্দপুরুষের ভূমি থেকে উৎখাত হয়ে যায় ইহুদি, খ্রিস্টান, প্যাগান, অগ্নি উপাসক জরথুস্ত্রবাদীরা। অনেকেই পিতৃপুরুষের ধর্ম ত্যাগ করতে রাজি না হওয়ায় বিকল্প পথ হিসেবে তরবারির নিচে মাথা পেতে দেয়। আবার অনেকেই রাতের অন্ধকারে নিজেদের সহায়-সম্পত্তি ফেলে প্রাণ বাঁচাতে নিজেদের সন্তান-সন্ততিসহ আরব থেকে বিতাড়িত হয়। এতে সারা আরবভূমি মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত হয় অর্থাৎ আরবে একমাত্র ইসলাম ছাড়া আর অন্য কোনো ধর্মের স্থান রইল না। এরপর হযরত আবু বকর মৃত্যুর পূর্বে নিজের পছন্দমত নিযুক্ত করে যান আরেকজন স্বৈরাচারী শাসক, যিনি নবীজি জীবিত থাকতে লৌহমানব হিসেবেই খ্যাত ছিলেন; হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)।

ওমর (রাঃ) মসনদে বসেই ইরাক ও ইরান নামক দুটি দেশকে একেবারে তছনছ করে দিলেন। খালিদ বিন ওয়ালিদের চেয়েও ভয়ঙ্কর, উবায়েদ, তালহা, জুবায়ের, আব্দুর রহমান, সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস ও মোতানার মতো আরবের ত্রাসের হাতে তুলে দেন সামরিক ভার। ইরাক ও ইরানের কতো শত জীব, কতো মানুষ আর পশু যে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ওমরের তলোয়ারের নিচে প্রাণ দিয়েছিল তার সঠিক হিসাব হয়তো কেউ কোনোদিন আর জানতে পারবে না। মোটামুটি সাড়ে দশ বছর শাসন-শোষণ করে মৃত্যুর পূর্বে ওমর তাঁর নিজের ও আবু বকরের একনায়কতন্ত্রের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার লক্ষ্যে খলিফা নির্বাচনের দায়িত্ব দিয়ে গেলেন আব্দুর রহমান বিন আউফ ও তাঁর (ওমরের) পুত্র আব্দুল্লাহর হাতে। তারা দুইজন অন্ধকার ঘরে গোপন বৈঠক করে নিয়ে এলেন নবী মুহাম্মদের দুই কন্যার স্বামী, উমাইয়া বংশের আফফানের পুত্র সত্তর বছর বয়স্ক হযরত উসমানের (রাঃ) নাম। হজরত আলি (রাঃ) চিৎকার করে বল্লেন—'আমি মানি না, এটা প্রহসন, ধর্মের নামে মিথ্যাচার, অন্যায়, এটা প্রতারণা!'

আরবি নববর্ষ, হিজরি ২৪ সনের মহর্‌রমের পহেলা তারিখ, ৬৪৪ খ্রিস্টাব্দের ৭ নভেম্বর উসমান (রাঃ) ইসলামের তৃতীয় খলিফা হিসেবে খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। উপমহাদেশের বিশিষ্ট ইসলামি পণ্ডিত সৈয়দ আমির আলির ভাষায় : "ধার্মিক এবং সৎ হলেও হযরত উসমান (রাঃ) ছিলেন অতিবৃদ্ধ ও দুর্বলচেতা মানুষ, প্রশাসনের ক্ষেত্রেও অনুপযুক্ত। অচিরেই তিনি পরিবারবর্গের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়লেন, যা অনুমানই করা গিয়েছিল।" (দ্রষ্টব্য : *এ শর্ট হিস্ট্রি অব্ স্যারাসিনস*, পৃষ্ঠা ৪৫)। উসমানের খেলাফত লাভে যারপর নাই খুশি হলো মক্কার উমাইয়াগণ, বিব্রতবোধ করলো হাশিমিগণ। পরপর তিনজন খলিফা ক্ষমতায় আসার পর, মক্কা থেকে আগত শরণার্থীদের দূরাভিসন্ধি সম্বন্ধে অভাগা মদিনাবাসীদের বুঝতে বাকি রইলো না। তারা বুঝতে পারলো, কোরায়েশগণ মদিনা দখল করে নিয়েছে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কাঠামোতে মদিনাবাসীর কোনো স্থান নেই। এতদিন পরেও প্রফেট মুহাম্মদের (দঃ) কথিত 'সাম্যবাদী' ইসলাম মক্কা-মদিনার মুসলমান ও উমাইয়া-হাশিমিদের ভেতরকার বৈষম্য দূর করতে পারলো না। খলিফা উসমানের খেলাফতের মাধ্যমে এবার ইসলামের ঘরে অনলের স্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠলো, যা হজরত আয়েশার যুগে এসে দাবানলে পরিণত হয়। এই প্রবেন্ধর শেষভাগে তা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা হবে।

উসমান (রাঃ) ক্ষমতা লাভের পরপরই এক বিরাট কাণ্ড করে বসেন। অন্যান্য বিখ্যাত সাহাবিদের মতে যা ছিল, রসুল মুহাম্মদের সংবিধান 'আল-কোরানে'র পরিপন্থী। খলিফা উসমানকে একসাথে তিনটি খুনের এক আসামীর বিচার করতে হয়। দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমরের (রাঃ) ছেলে হজরত ওবায়দুল্লাহ (রাঃ) একদিনে তিনটি নিরপরাধ মানুষকে খুন করেছিলেন। ঘটনাটি ছিল এরকম : হজরত ওমরের কাছে, ফিরোজ আবু লুলু নামের এক ব্যক্তি, তার ওপর আরোপিত করের পরিমাণ কমানোর আবেদন জানায়; পারসিয়ান দেশের ফিরোজকে মুসলমানগণ এক যুদ্ধে বন্দী করে দাস হিসেবে বিক্রি করেছিলেন। দাসত্ব হতে মুক্তি পাওয়ার লক্ষ্যে ফিরোজ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে পরবর্তীতে খ্রিস্টধর্মে ফিরে যায়। হজরত ওমর (রাঃ) ফিরোজের 'কর কমানোর' অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। কুফায় বসবাসকারী ফিরোজ কাঠমিস্ত্রি কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতো। সে মদিনায় চলে আসে। একদিন ওমরকে নির্জন মসজিদে পেয়ে ছুরি দিয়ে ছয়টা আঘাত করে এবং সে নিজেও আত্মহত্যা করে। ছুরিকাঘাতে আহত হওয়ার তিনদিন পর ওমর (রাঃ) মারা যান। পরদিন হজরত ওমরের ছেলে ওবায়দুল্লাহ পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে প্রথমে পারস্য থেকে আগত হরমুজান ও হজরত সাদের (রাঃ) ক্রীতদাস জুফাইনাকে খুন করেন। হরমুজান ও জুফাইনাকে খুন করে ওবায়দুল্লাহ ফিরোজের বাড়িতে যান। ফিরোজকে না পেয়ে তার মেয়েকে তিনি খুন করেন। একসাথে তিনজনকে হত্যার কারণ হিসেবে কথিত আছে, খলিমা ওমর যেদিন আহত হন, তার আগের দিন সন্ধ্যায় কোনো এক নির্জন স্থানে ওমর পুত্র ওবায়দুল্লাহ তাদের তিনজনকে একত্রে কানাকানি করতে দেখেছেন! হযরতের উসমানের খেলাফতকালে দ্বিতীয় খলিফা ওমর পুত্র দ্বারা সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের বিচার বসলো। পৃথিবী আজ এত বড় নৃশংস হত্যার ইসলামি আইনের সুবিচার দেখতে চায়। খলিফা উসমানের মুখের দিকে চেয়ে আছে মজলুম ওয়ারিশগণ। কোরান-হাদিস সামনে নিয়ে বসেছেন হজরত আলিসহ বেশ কয়েকজন শরিয়া বিশেষজ্ঞ সাহাবি। (তবে বলে রাখা ভালো কোরান-হাদিস তখনো পুস্ত

াকাকারে তৈরি হয়ে যায়নি; বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা টুকরো টুকরো কোরানের মেটারিয়েল বা আয়াতের হস্তলিপি ও মুহাম্মদের (দঃ) মুখের কথা ও কাজ যে যেভাবে শুনেছেন, বুঝেছেন, দেখেছেন তাই শরিয়ার আইন বলে মানতেন)। গণরায় হয়েই গেছে। ফিকাহ্ শাস্ত্রকারগণ একমত যে, দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমরের পুত্র ওবায়দুল্লাহর নিশ্চিত মৃত্যুদণ্ড হবে; কারণ, নিহত তিন ব্যক্তির একজন পারস্য থেকে আগত হরমুজান ছিলেন মুসলমান। শরিয়ত অনুযায়ী একজন মুসলমানকে হত্যা করলে হত্যাকারীর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। দ্বিতীয়জন একজন সাহাবির ক্রীতদাস। তৃতীয়জন একজন নারী, যে খলিফা ওমরের খুন সম্বন্ধে কিছুই জানে না এবং জড়িত নয়। হজরত আলি অপরাধী ওবায়দুল্লাহর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড দেয়ার পক্ষে তার অভিমত প্রকাশ করলেন। সাহাবি হজরত আমর ইবনুল আস ও তাঁর মতো, হজরত ওমরের কয়েকজন গুণধর অনুগত বিচার চলাকালীন সময়ে দাঁড়িয়ে হজরত আলির দেওয়া রায়ের প্রতিবাদ করলেন। খলিফা উসমান কোরান-হাদিস অনুসরণ করলেন না। শরিয়া আইন ও বিশ্ববিবেককে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে হজরত ওবায়দুল্লাহকে দণ্ডমুক্ত করে দিলেন। খলিফা ওমরের শত্রুরা বেজায় খুশি হলেও দুঃখিত হলো মদিনাবাসী। এ ঘটনায় ক্ষিপ্ত হয়ে মদিনার বিখ্যাত মুসলিম কবি জিয়াদ ইবনে লবিদ খলিফা উসমান, ঘাতক ওবায়দুল্লাহ ও শরিয়া আইনের ওপর ব্যঙ্গ করে এক কবিতা রচনা করলেন, লোকে প্রকাশ্যে মদিনার রাস্তায়-রাস্তায় সেই কবিতা আবৃত্তি করলো অনেক দিন। ব্যঙ্গ কবিতার খবর হযরত উসমানের কানে পৌঁছলে কবি জিয়াদ ইবনে লবিদকে ধরে নিয়ে এসে বেশি বাড়াবাড়ি না করার জন্য সাবধান করে দিলেন।

কিছুদিন পরেই মদিনায় খাদ্যাভাব দেখা দিল। ডাকাতি আর লুটের মালের গুদাম শূন্য হতে চলেছে। রাষ্ট্র আর চলে না। সবচেয়ে বেশি বিপদের সম্মুখীন হলো মদিনাবাসী। তারা পেশায় ছিল কৃষিজীবী। লুটের ব্যবসায় অভ্যস্থ ছিল না, তাই তারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতো না। গনিমতের মাল (নারী ও সম্পদ) তাদের ভাগ্যে জুটতো না। পক্ষান্তরে মক্কার কোরায়েশগণের জীবিকা ছিল মেষ-ছাগল চড়ানো ও কাবা ঘরের সেবাযত্ন করা। আজ কোরায়েশগণ ইরান, ইরাক, সিরিয়া, মিশরসহ সারা আরব-বিশ্বের প্রায় প্রতিটি এলাকায় কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকারি পদে অধিষ্ঠিত। মেষ পালক-পুরোহিত থেকে রাষ্ট্রনায়ক। প্রায় স্বপ্নের মতোই বদলে গেল আরবের মানচিত্র। দখলকৃত দেশে দেশে কোরায়েশ শাসকগণ অগণিত ক্রীতদাসীভোগ, অবাধ সম্পদের প্রাচুর্যে বিলাসবহুল জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠলো। মদিনা থেকে উসমানের (রাঃ) কেন্দ্রীয় সরকার উপযুক্ত ট্যাক্স পাঠাতে চিঠি লিখলেন দখলকৃত রাজ্যের গভর্নরদের কাছে। কিছুকিছু এলাকার অমুসলিম সরকারগণ ট্যাক্স পাঠানো তো দূরের কথা, তারা ইসলামি শাসন অস্বীকার করে স্বাধীনতা ঘোষণা করলো। স্বয়ং মুসলিম সরকার, মিসরের গভর্নর হজরত আমর ইবনুল আস (রাঃ) খলিফা হযরত উসমানের চিঠির উত্তরে জানালেন : 'উষ্ট্রী এর বেশি দুধ দিতে অপারগ।' তিনিই সাহাবি হজরত আমর ইবনুল আস, যিনি হজরত ওমরের খুনি পুত্র ওবাদুল্লাহকে শাস্তি না দেওয়ার জন্য খলিফা উসমানকে পরামর্শ দিয়েছিলেন। এবার খলিফা উসমান (রাঃ) ভীষণ রাগান্বিত হলেন। তিনি হজরত আমর ইবনুল আসকে পদচ্যুতির আদেশ দিলেন। তাঁর স্থলে পৌর্ট সাঈদের সামরিক শাসনকর্তা আবদুল্লাহ বিন সাদ বিন আবি সারাহকে সমগ্র মিশরের গভর্নর পদে নিযুক্ত করেন। প্রসঙ্গত এখানে হজরত আব্দুল্লাহ বিন সাদ বিন আবি সারাহ (রাঃ) সম্পর্কে পূর্বের একটি ঘটনার বর্ণনা 'পুনরায়' উল্লেখ করছি : ৬৩০ খ্রিস্টাব্দের দিকে মক্কা দখলের পর মুহাম্মদ (দঃ) তাঁর কয়েকজন (আট/দশজন) সঙ্গী-সাথী, সহকর্মী ও এককালের শুভাকাঙ্ক্ষীদের হত্যার তালিকা তৈরি করলেন। আব্দুল্লাহ বিন সাদ বিন আবি সারাহ তাদের একজন। তাদেরকে হত্যা করা হবে; কারণ মুহাম্মদের (দঃ) সন্দেহ হলো এরা একদিন তাঁর 'নবীত্ব' ও 'ইসলাম ধর্ম'কে মিথ্যা প্রমাণিত করে ফেলবে।

কোরানের প্রথম সংকলক আবদুল্লাহ্ বিন সাদ কেন মুরতাদ হয়ে গিয়েছিলেন?

আবদুল্লাহ্ বিন সাদ বিন আবি সারাহ মুহাম্মদের (দঃ) মুখে বলা কোরান মাঝে মাঝে লিখে রাখতেন। মুহাম্মদ (দঃ) মাঝে মাঝে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করতে গিয়ে ঘটনায় কিছুকিছু পরিবর্তন করে ফেলতেন, এবং আব্দুল্লাহ বিন সাদ সেটা ধরে ফেলতেন। আব্দুল্লাহ বিন সাদের মনে কোরানের অলৌকিকত্ব নিয়ে সন্দেহ দেখা দেয়। আস্তে আস্তে সন্দেহ গাঢ় হলে তিনি কৌশলে নবীজির সামনেই কোরানের আয়াত সংশোধন করে ফেলেন; কিন্তু এতে নবীজি কোনো দ্বিমত করলেন না। তখন আব্দুল্লাহ বিন সাদের কথিত 'আল্লাহর বাণী' কোরানের ওপর থেকে বিশ্বাস ওঠে যায় এবং প্রকাশ্যে ইসলাম ত্যাগ করে মক্কার কোরায়েশ বংশের পৌত্তলিকদের সাথে যোগ দেন। কপাল ভাল যে, মক্কা অভিযানের পরপরই নবীজির তৈরি করা হত্যা তালিকায় সর্বাগ্রে থাকা আব্দুল্লাহ বিন সাদের নাম সৎভাই (*টমেতরে বরতেভরে*) হজরত উসমান আগেই জেনে গিয়েছিলেন। হজরত উসমান মুহাম্মদের (দঃ) কাছে আবদুল্লাহ বিন সাদের প্রাণ ভিক্ষা চাইলেন। মুহাম্মদের (দঃ) আদেশ পেয়ে ঘাতক শাণিত তরবারি হস্তে

শিরোপরে দণ্ডায়মান ছিল। কিন্তু মুহাম্মদ (দঃ) তাঁর দুই মেয়ের স্বামী, জামাতা উসমানের অনুরোধ উপেক্ষা করে অঙ্গুলি নির্দেশ করতে পারলেন না; চুপ করে রইলেন। আবদুল্লাহ বিন সাদ (রাঃ) প্রাণ ভিক্ষা পেলেন। নবীজির এক সময়কার প্রিয়ভাজন ও বিশ্বস্ত কোরান লেখক আবদুল্লাহ বিন সাদের 'অপরাধের' প্রমাণ আজো কোরানেই আছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আল বাদাওয়ী (মৃত ১২৮৬) তাঁর তাফসির '*আছরারুত্ তান্‌জিল ওয়া আছরারুত্ তা'য়ীল*' (Asrar ut-tanzil wa Asrar ut-ta'wil) গ্রন্থে বর্ণনা করেন[১১] : একদিন মুহাম্মদ (দঃ) সুরা আলমুমিনুন এর ১২ থেকে ১৪ পর্যন্ত বাক্যগুলো (আয়াত) লিখার জন্যে আবদুল্লাহ বিন স'াদকে বললেন। বাক্যগুলো ছিল : 'আর আমরা নিশ্চয়ই মানুষকে সৃষ্টি করেছি মাটির নির্যাস থেকে।' (আয়াত ১২)। 'অতঃপর আমরা তাকে বীর্যরূপে এক নিরাপদ অবস্থান স্থলে স্থাপন করি।' (আয়াত ১৩)। 'এরপর আমরা বীর্যকে তৈরি করেছি একটি জমাট রক্তপিণ্ডে, তারপর রক্তপিণ্ড থেকে মাংসপিণ্ড তৈরি করেছি, তারপর মাংসপিণ্ড থেকে হাড় তৈরি করে, অতঃপর হাড়গুলোকে মাংস দ্বারা আবৃত করেছি। অবশেষে তাকে নতুন রূপে দাঁড় করিয়েছি।' (আয়াত ১৪)। রসুল মুহাম্মদ ১৪নং বাক্যটুকু বলার পর আব্দুল্লাহ বিন সাদ তাঁর সাহিত্যিক ভাষায় বলে উঠলেন, 'নিপুণ স্রষ্টা আল্লাহ কত মহান!' প্রফেট বললেন, 'এই বাক্যটাও লাগিয়ে দাও।' আবদুল্লাহ বিন সাদ হতবাক হয়ে গেলেন। মনে মনে বললেন বিষয়টা কি, আমার মুখের কথা অল্লাহর বাণী হয় কিভাবে? আস্তে আস্তে আবদুল্লাহ নিশ্চিত হয়ে গেলেন যে কোরান মুহাম্মদ বানিয়ে বানিয়ে তৈরি করছেন, এসব কোনো ঐশীবাণী নয়।[১২] এরপর তিনি নবীজি এবং কোরানের ওপর আস্থা না রাখতে পেরে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে নবী মুহাম্মদ থেকে দূরে সরে গেলেন।[১৩]

এখন আমরা সাহাবি হজরত আমর ইবনুল আসের (রাঃ) পরিচিতিটুকুও জেনে নিলে পরবর্তী ঘটনা ঝুঝতে সুবিধা হবে। হজরত ওমর (রাঃ) যখন ইরাক দখলের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, লোকে বললো, আবু বকরের (রাঃ) আমলের সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ) ছাড়া ইরাক দখল করা সম্ভব হবে না। দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, খালিদ বিন অলিদের চেয়েও বিচক্ষণ শক্তিশালী সেনাপতি আমার আছে। তিনি হজরত আমর ইবনুল আসের প্রতিই ইঙ্গিত করেছিলেন। আমর ইবনুল আস শুধু ইরাকই নয়, পশ্চিম সিরিয়া, জেরুজালেমও দখল করে নেন। হজরত ওমর (রাঃ) খুশি হয়ে তাকে মিশর দখল করার দায়িত্ব দেন। মিশর ও আলেকজান্দ্রিয়া দখল করে আমর ইবনুল আস প্রমাণ করে দিলেন যে, তিনি খালিদ বিন ওয়ালিদের চেয়েও পরাক্রমশালী যোদ্ধা। আলেকজান্দ্রিয়া দখল করে তিনি খলিফা ওমরকে (রাঃ) চিঠি লিখলেন : "আমিরুল মুমেনিন, আজ আমি এমন একটি জাতিকে আপনার দাসত্ব স্বীকারে বাধ্য করিলাম, যারা কোনোদিন পরাধীনতা সহ্য করিতে পারে না। এমন একটি নগরী আপনার পদতলে উপহার দিলাম, যে নগরীতে চার হাজার প্রাসাদ ও চার হাজার হাম্মাম (গোসলখানা) রহিয়াছে। চারশত ভোজনাগার ও প্রমোদালয় আছে, যেখানে এসে গ্রিক-রাজপুত্রগণ পানাহার ও চিত্তরঞ্জন করিতো। এই নগরীর এক প্রান্থে সুপ্রসিদ্ধ সিরাপিয়াম, যার ভিতরে দেবী সিরাপার মন্দির ও আলেকজান্দ্রিয়ার সুপ্রসিদ্ধ পাঠাগার অবস্থিত। অপর প্রান্থে বিখ্যাত সিজারির মন্দির, যাহা মিশর বিজয়ী খ্যাতনামা জুলিয়াস সিজারের সম্মানে রাণী ক্লিওপেট্রা কতৃক নির্মিত হইয়াছিল।" চিঠি পেয়ে খলিফা ওমর (রাঃ) যারপর নাই খুশি হলেন। প্রায় চৌদ্দমাস যুদ্ধ করে আমর ইবনুল আস (রাঃ) রোম সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র আলেকজান্দ্রিয়া দখল করেন হিজরী বিশ সনে। গ্রিকগণ এ পরাজয় মেনে নিতে পারলো না। তাদের সম্রাট হিরোক্লিয়াসের মৃত্যুর পর তাঁর মেয়ে, আলেকজান্দ্রিয়া পুনরুদ্ধারের প্রস্তুতি নেন।

(৪)

[১১] '*The Secrets of Revelation and The Secrets of Interpretation*' edited by H. O. Fleischer, 2 vols., Leipzig, 1846-1848; indices ed. W. Fell, Leipzig, 1878.

[১২] Abdu'llah bin Sa'ud bin Abi Sarih was an amanuensis of the Prophet. And, when the words descended 'We created man of fine clay;' and when the words were finished. Then brought We forth him by another creation;' 'Abdu'llah exclaimed 'Blessed therefore be God the most excellent of Makers. He has created man in a wonderful manner.' Upon this (Muhammad) said, 'Write those (words) down, for so it has descended.' But 'Abdu'llah doubted and said, 'If Muhammad speak truth, then on me also has inspiration descended as upon him; and if Muhammad speak falsely, then verily I but speak as he did.' Please see: http://www.mukto-mona.com/Articles/akash/abdulla_bin_sad.pdf

[১৩] আরো দেখুন : Al-Wahidi Al-Naysaboori, '*Asbab Al-Nuzul*' (*Great Commentaries on the Holy Qur'an*), Beirute's Cultural Libary Edition, "Tub'at Al-Maktabah Al-thakafiyyah Beirute", Page 126.

পাঁচ বছর পর হিজরি পঁচিশ সনের কথা। ইতোমধ্যে উসমান (রাঃ) কর্তৃক আমর ইবনুল আস মিশরের শাসন কর্তৃত্ব হতে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে গেছেন। গ্রিক সম্রাট কনস্টানটাইন, এক বছরের মধ্যে শুধু আলেকজান্দ্রিয়া থেকে দখলদার মুসলিমদিগকে বিতাড়িত করেননি, সমগ্র মিশরকেও মুসলিম শাসনমুক্ত করে ফেলেন। বিপদে পড়লেন খলিফা উসমান (রাঃ)। বাধ্য হয়ে সাহাবি আমর ইবনুল আসের শরণাপন্ন হলেন এবং মিশর পুনরুদ্ধারের অনুরোধ জানালেন। প্রায় বিনা যুদ্ধেই আমর ইবনুল আস মিশর ও আলেকজান্দ্রিয়া পুনরায় মুসলমানদের দখলে নিয়ে আসেন। খলিফা উসমান বাধ্য হয়ে আমর ইবনুল আসকে মিশরের সেনাবাহিনী ও রাজস্ব বিভাগের দায়িত্ব দিয়ে দেন; কিন্তু গভর্নর থাকলেন আব্দুল্লাহ বিন সাদ বিন আবি সারাহ। মিশরে গর্ভনর আব্দুল্লাহ বিন সাদ বিন আবি সারাহ ও সেনাবাহিনী প্রধান আমর ইবনুল আসের দ্বৈত শাসন শুরু হলো। এই দুই সাহাবি একে অপরের চক্ষুশূল ছিলেন। ক্ষমতার দ্বন্দ্বে তাঁরা একে অপরের ব্যাপারে পরস্পর-বিরোধী নির্দেশ জারি করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটির তদন্তের দায়িত্ব নিলেন স্বয়ং খলিফা উসমান। হজরত আবদুল্লাহ বিন সাদের অভিযোগ হলো : 'হজরত আমর ইবনুল আস গ্রিকদের সাথে যুদ্ধকালে আলেকজান্দ্রিয়া দখল করে, সাধারণ মানুষের বাড়িঘর লুণ্ঠন করে প্রচুর মালামাল আত্মসাৎ করেছেন। অনেক গ্রিক নারীকে তাঁর ব্যক্তিগত দাসীরূপে রেখে দিয়েছেন এবং জনগণের কাছ থেকে জোরপূর্বক মাত্রাতিরিক্ত কর আদায় করছেন।' পক্ষান্তরে আমর ইবনুল আসের (রাঃ) অভিযোগ হলো : 'আবদুল্লাহ বিন সাদ ঔদ্বত্যপূর্ণ ও রুক্ষ চরিত্রের মানুষ। তিনি নবীজির অভিশপ্ত লোক এবং কোরানকে 'আল্লাহর বাণী' বলে বিশ্বাস করেন না।' আবদুল্লাহ বিন সাদের ওপর আনীত শেষোক্ত অভিযোগ সম্বন্ধে সম্ভবত হজরত উসমানের চেয়ে বেশি কেউ জানতেন না। তিনি তাঁর দুধভাইকে তিনদিন নিজের ঘরে লুকিয়ে রেখে মুহাম্মদের (দঃ) কতলাদেশ থেকে বাঁচিয়েছিলেন। খলিফা উসমান বিচারে হজরত আমর ইবনুল আসকে দোষী সাব্যস্ত করেন। তাঁকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকে আবারো বহিষ্কার করে উসমান যেন সর্পের গর্তে হাত দিলেন। হজরত আমর ইবনুল আস, খলিফা উসমানের স্বজনপ্রীতিতে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়ে সিংহের মতো গর্জে উঠলেন। তিনি সোজা মদিনায় চলে এলেন। এবার প্রতিশোধ গ্রহণের পালা। আমর ইবনুল আসের নেতৃত্বে খলিফার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু হলো।

৬৪৪ খ্রিস্টাব্দের দিকে হযরত উসমান ক্ষমতায় আসার মাত্র এক বছরের মধ্যে একদিকে রাষ্ট্রের যেমন অভ্যন্তরীণ বিরোধ, অঙ্গরাজ্যের গভর্নরদের কর প্রদানে অনিয়ম, অন্যদিকে হাশিমি ও উমাইয়া গোত্রের মধ্যকার তিক্ততা এবং সর্বোপরি মদিনায় খাদ্যাভাবে খলিফা ভীষণ চিন্তিত হলেন। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এলেন সিরিয়ার গভর্নর (উমাইয়া গোত্রের নেতা আবু সুফিয়ান পুত্র) হজরত মুয়াবিয়া (রাঃ)। পরামর্শ দিলেন আর্মানিয়া ও পার্শ্ববর্তী এলাকা এশিয়া মাইনর আক্রমণ করতে হবে। উসমান (রাঃ) ক্ষমতায় আরও কিছুদিন থাকার ভরসা পেলেন, অন্তত আয়ের একটা পথ খুঁজে পাওয়া গেল; কারণ যুদ্ধ মানেই প্রচুর গনিমতের মাল অর্জন। হজরত মুয়াবিয়ার কথামতো খলিফা উসমান কুফার সালমান বিন রুবাইয়াকে আট হাজার সৈন্য নিয়ে সিরিয়ার দিকে রওয়ানা হতে নির্দেশ দেন। আর্মানিয়ার পথে সেনাপতি সালমান (রাঃ) তাঁর দল নিয়ে সিরিয়া বাহিনীর সাথে মিলিত হন। পারস্য ও গ্রিসের মধ্যবর্তী পার্বত্যাঞ্চল আর্মানিয়া চিরদিনই সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তির দৃষ্টিগোচরে ছিল। আর্মানিয়ার স্বাধীনচেতা অধিবাসীদের কেউই বেশিদিন আবদ্ধ রাখতে পারেনি। এ দেশ পারস্য ও গ্রিস কর্তৃক বহুবার অধিকৃত হয়েছে। হজরত ওমরের (রাঃ) মুসলিম বাহিনী যখন গ্রিকদের হাত থেকে অঞ্চলটি দখল করে, তখনও আর্মানিয়াগণ জানতো, এ অধীনতা সাময়িক। খলিফা উসমানের সময়ে তারা মদিনায় কর পাঠানো বন্ধ করে দিল। হিজরি পঁচিশ সনের শেষের দিকে সিরিয়া ও ইরাকের সম্মিলিত বিরাট মুসলিম সেনাবাহিনী আর্মানিয়ার পর্বতমালা অতিক্রম করে তার অভ্যন্তরীণ মালভূমি এলাকায় এসে উপনীত হয়। ওমরের (রাঃ) মৃত্যুর পর মাত্র কিছুটা দিন আর্মানিয়ানগণ শান্তিতে ছিল। আবার 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনিতে প্রকম্পিত হয়ে উঠলো পাহাড়ি অঞ্চল। স্বাধীনচেতা আর্মানিয়ানগণ দেশমাতৃকার জন্যে অকাতরে জীবন দিতে পাহাড় বেয়ে নেমে আসলো। ক্ষুধার্ত সিংহের মতো তাঁদের ওপর ঝাপিয়ে পড়লো মুসলিম সৈন্যগণ। লোমহর্ষক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে মুসলিমদের তেজস্বী তলোয়ারের নিচে গলা পেতে দিল আর্মানিয়ার সহস্রাধিক তাজা প্রাণ। পাহাড়ের শ্বেতবর্ণের ঝর্ণারাশি রঙিন হলো আর্মানিয়ানদের রক্তের স্রোতধারায়। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তারা পূর্বাপেক্ষা দ্বিগুণ হারে কর দেবার শর্তে মুসলমানদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হলো। আর্মানিয়া দখল করে মুসলিম সেনাবাহিনী স্বদেশে ফিরে গেলেন না। তারা সাম্রাজ্য বিস্তারের কাজ পুরোদমে চালিয়ে গেলেন। বিজয়ানন্দে উৎফুল্ল মুসলমানগণ অতি সহজেই আর্মানিয়ার পশ্চিম দিকে তিফলিশ নগরী দখল করে কৃষ্ণসাগর তীরে এসে পৌঁছিলেন। সেখান থেকে দক্ষিণ দিকে ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূলে লেভান্ট শহর। এখানে গ্রিকদের সাথে তাদের তুমুল যুদ্ধ হয়। মুসলিম সৈন্যদের গতিরোধ করার মতো শক্তি সম্ভবত তখনকার পৃথিবীতে কারো ছিল না। সুতরাং তারা এখানেও জয়ী হলেন। দেশের পর দেশের, যুগ যুগান্তরের ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন কৃষ্টি ও সনাতন সভ্যতা ধ্বংস করে মুসলমানগণ আত্মতৃপ্তি বোধ করতে লাগলেন। কিন্তু কাসপিয়ান থেকে আরব সাগর পর্যন্ত বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতি, আরব জাতির প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো। হজরত ওমরের আমলের দখলকৃত কিছু কিছু এলাকায় তাঁর জীবিত থাকাকালেই বিদ্রোহ চলছিল। তন্মধ্যে পারস্যের বিদ্রোহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হজরত ওমরের (রাঃ) যুগের পলাতক পারস্য সম্রাট ইয়াযদ্‌গার্দ খলিফা উসমানের শাসনকালে মুসলমানদের হাত থেকে স্বদেশ পুনুরুদ্ধারের প্রস্তুতি নিলেন। অষ্টাশি বছর বয়স্ক ইয়াযদ্‌গার্দকে 'সিংহ-রূপী' মুসলমানদের সম্মুখ হতে 'মূষিক ছানা'র মতো পালিয়ে খোরাসানে আশ্রয় নিতে হলো। খোরাসান ছিল

পারস্যের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ এলাকা। হজরত উসমান (রাঃ) ঘোষণা দিলেন, যে আগে খোরাসানে প্রবেশ করতে পারবে, সেই হবে সেখানকার শাসনকর্তা। সুতরাং মুসলিম বাহিনী এলাকাটি দখল করে নিতে আর দেরি করলেন না। এ ছিল ছয়শত একান্ন খ্রিস্টাব্দের ঘটনা।

ভূমধ্যসাগর, পূর্ব এশিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার উপকূলভাগ বিধৌত করায়, সাগরবক্ষ হতে উল্লিখিত দুই মহাদেশের উপকূলবর্তী জনপদসমূহের ওপর আক্রমণ করার স্বপ্ন হজরত মুয়াবিয়াকে (রাঃ) রাত দিন তাড়া করতো। রোম সাম্রাজ্যের পূর্ব মেডিটারেনিয়ান এলাকায় অবস্থিত সাইপ্রাস দ্বীপটি দখলের অভিপ্রায় তাঁর বহুদিনের। হজরত ওমরের সময়ে মুয়াবিয়া (রাঃ) সাইপ্রাস, পাকিস্তান (তখনকার সময়ের ভারতবর্ষ) ও ভারতের কিছু সমৃদ্ধ অঞ্চল দখল করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। হজরত ওমর (রাঃ) তখন তাঁর সেনাপতি আমর ইবনুল আসের পরামর্শে হজরত মুয়াবিয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। খলিফা উসমানের কাছে হজরত মুয়াবিয়া আবার সাইপ্রাস দ্বীপ দখলের প্রস্তাব পাঠালেন। জলযুদ্ধে মুসলিমদের অদক্ষতার কথা স্মরণ করে খলিফা উসমান সংকিত হলেন। কিন্তু মুয়াবিয়ার সাইপ্রাস দখলের প্রয়োজনীয়তার যুক্তি অস্বীকার করতে পারলেন না। যুদ্ধের অনুমতি দিলেন সত্য, তবে একটি ব্যাপারে সতর্ক করে দিলেন। উসমান তাঁর খেলাফতের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পেরেছেন : বিগত অনেক যুদ্ধে বিভিন্ন এলাকার অমুসলিম, পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিত কিছুকিছু লোক শুধুমাত্র যুদ্ধলব্ধ সম্পদের লোভে ইসলাম গ্রহণ করে। তাঁর বিশ্বাস এরা সঙ্গবদ্ধ হয়ে একদিন ইসলামের খলিফার বিরুদ্ধাচরণ করবে। খলিফার এই বিশ্বাস মোটেই অমূলক ছিল না। ইসলামের ইতিহাস, সাধারণ মানুষের মনে এই বিশ্বাসেরই জন্ম দিয়েছিল যে যুদ্ধই জীবিকা নির্বাহের একমাত্র উপায়।

মুহম্মদ (দঃ) এবং তার পরবর্তী খলিফাদের সময়কালে সংঘটিত যুদ্ধ

মুহম্মদের জীবনীকারদের দেয়া তথ্যের সাপেক্ষে জানা যায় যে মহানবী তার জীবনের শেষ ২৩ বছরে প্রায় সত্তুর থেকে একশতটি হানা যুদ্ধের (Raid) সাথে জড়িত ছিলেন। এর মধ্যে সতের থেকে উনত্রিশটি যুদ্ধে তিনি নিজে নেতৃত্ব দেন। নীচে মুহম্মদের (দঃ) সময়ের এবং তার পরবর্তী প্রধান প্রধান যুদ্ধগুলোর তালিকা দেয়া হল-

৬২৩ খ্রীস্টাব্দ - বোয়াতের যুদ্ধ
৬২৩ খ্রীস্টাব্দ - কাহারের যুদ্ধ
৬২৩ খ্রীস্টাব্দ - ওয়াদ্দানের যুদ্ধ
৬২৩ খ্রীস্টাব্দ - সাফওয়ানের যুদ্ধ
৬২৩ খ্রীস্টাব্দ - জুল আশিরের যুদ্ধ
৬২৪ খ্রীস্টাব্দ - নাখালার যুদ্ধ
৬২৪ খ্রীস্টাব্দ - বদরের যুদ্ধ
৬২৪ খ্রীস্টাব্দ - বনি সালিমের যুদ্ধ
৬২৪ খ্রীস্টাব্দ - 'ঈদ-উল-ফিতর' এবং 'জাকাত উল ফিতর'-এর যুদ্ধ
৬২৪ খ্রীস্টাব্দ - বনি কায়নুকার যুদ্ধ
৬২৪ খ্রীস্টাব্দ - বনি সাওয়িকের যুদ্ধ
৬২৪ খ্রীস্টাব্দ - ঘাটফানের যুদ্ধ
৬২৪ খ্রীস্টাব্দ - বাহরানের যুদ্ধ
৬২৫ খ্রীস্টাব্দ - ওহুদের যুদ্ধ
৬২৫ খ্রীস্টাব্দ - হামরা-আল আসাদের যুদ্ধ
৬২৫ খ্রীস্টাব্দ - বনি নাদিরের যুদ্ধ
৬২৫ খ্রীস্টাব্দ - জাতুর রিকা যুদ্ধ
৬২৬ খ্রীস্টাব্দ - বাদরু উকরা যুদ্ধ
৬২৬ খ্রীস্টাব্দ - জুমাতুল জানদালের যুদ্ধ

৬২৬খ্রীস্টাব্দ - বনি মুস্তালিকের যুদ্ধ
৬২৭খ্রীস্টাব্দ - আহজাবের/ খন্দকের যুদ্ধ
৬২৭খ্রীস্টাব্দ - বনি কুরাইজার যুদ্ধ
৬২৭খ্রীস্টাব্দ - বনি লাহয়ানের যুদ্ধ
৬২৭খ্রীস্টাব্দ - খাইবারের যুদ্ধ
৬২৮খ্রীস্টাব্দ - হুদায়বিয়ার ক্যাম্পেইন
৬৩০খ্রীস্টাব্দ - মক্কা দখল
৬৩০খ্রীস্টাব্দ - হানসিনের যুদ্ধ
৬৩০খ্রীস্টাব্দ - তাবুকের যুদ্ধ

৬৩২ সালে মুহম্মদ (দঃ) মৃত্যুবরণ করলে প্রথম খলিফা হন মুহম্মদের শ্বশুর আবু বকর (রাঃ) । তার নেতৃত্বে অনেকগুলো আক্রমণাত্মক যুদ্ধ সংগঠিত হয় । তার মধ্যে আছে -

৬৩২খ্রীস্টাব্দ- ওমান (দাবার যুদ্ধ), ইয়েমেন, ইয়ামাহ এবং উত্তর আরবের যুদ্ধ ।
৬৩৩খ্রীস্টাব্দ- সিরিয়া, মাহারা, হাদ্রামাউত, কাজিমা, ওয়ালাজা, উলিস এবং আনবারের যুদ্ধ ।
৬৩৪খ্রীস্টাব্দ- পারশিয়া, সিরিয়ার যুদ্ধ, বাসরা, ডামাস্কাস এবং আজনাদিনের যুদ্ধ ।

৬৩৪ সালে আবু বকর (রাঃ) মারা গেলে, মুহম্মদের আরেক শ্বশুর এবং সহযোদ্ধা হজরত ওমর (রাঃ) খলিফা হন । তার সময়ে ওমরের নির্দেশে যে যুদ্ধগুলো পরিচালিত হয় তা হল -

৬৩৪খ্রীস্টাব্দ- নামারাক এবং সাকাটিয়ার যুদ্ধ ।
৬৩৫খ্রীস্টাব্দ- ব্রিজ, বুয়াইব, দামাস্কাস এবং ফালের যুদ্ধ ।
৬৩৬খ্রীস্টাব্দ- ইয়ারমুক, কাদিসিয়া এবং মাদাইনের যুদ্ধ ।
৬৩৬খ্রীস্টাব্দ- জালুলার যুদ্ধ ।
৬৩৮খ্রীস্টাব্দ- ইয়ারমুক, জেরুজালেম এবং জাজিরার যুদ্ধ ।
৬৩৯খ্রীস্টাব্দ- খাজিস্তান এবং মিশরের লড়াই ।
৬৪১খ্রীস্টাব্দ- নিহাওয়ান্দের যুদ্ধ ।
৬৪২খ্রীস্টাব্দ- পারশিয়ার যুদ্ধ ।
৬৪৩খ্রীস্টাব্দ- আজারবাইজানের যুদ্ধ ।
৬৪৪খ্রীস্টাব্দ- ফার এবং খারানের যুদ্ধ ।

হজরত ওমর ৬৪৪ সালে নৃশংসভাবে নিহত হবার পর ক্ষমতায় বসেন হজরত উসমান (রাঃ) এবং ইসলামের নামে যুদ্ধ চালিয়ে যান -

৬৪৭খ্রীস্টাব্দ- সাইপ্রাসের যুদ্ধ যুদ্ধ ।
৬৫১খ্রীস্টাব্দ- বাইজেন্টাইনের লড়াই ।
৬৫১খ্রীস্টাব্দ- উত্তর আফ্রিকায় ইসলামের বিস্তার ।

খলিফা উসমানকেও হত্যা করা হয় ৬৫৬খ্রীস্টাব্দে । মহানবী তনয়া ফাতিমার স্বামী হজরত আলীর ক্ষমতা লাভ । এ সময় ইসলামের প্রাসাদ ষড়যন্ত্র এমনই ব্যাপক আকার ধারণ করে যে, মুসলিমরা নিজেরাই নিজেদের মধ্যে লজ্জাজনক যুদ্ধে জড়িয়ে পরে । এর মধ্যে অন্যতম হল-

৬৫৬খ্রীস্টাব্দ- হজরত আলী এবং মহানবীর স্ত্রী আয়েশার মধ্যকার 'জামালের যুদ্ধ' ।

৬৫৭খ্রীস্টাব্দ- হজরত আলী এবং মুয়াবিয়ার মধ্যকার 'সিফফিনের যুদ্ধ' ।

এ ছাড়া আরো যে ক'টি যুদ্ধ হজরত আলীর সময়ে সংগঠিত হয় সেগুলো হল -

৬৫৮খ্রীস্টাব্দ- হজরত নাহরোয়ানের যুদ্ধ ।
৬৫৮খ্রীস্টাব্দ- মিশরের যুদ্ধ ।

হজরত আলী ৬৬১খ্রীস্টাব্দে বিষাক্ত ছুরিকাঘাতে নিহত হলে, একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী হন মুয়াবিয়া । মুয়াবিয়ার নেতৃত্বে 'ইসলামী সাম্রাজ্য' বিস্তৃত হতে থাকে পুরোদমে -

৬৬২খ্রীস্টাব্দ- মিশর ইসলামের পদানত ।
৬৬৬খ্রীস্টাব্দ- সিসিলি আক্রমণ ।
৬৬৭খ্রীস্টাব্দ- কনস্টানটিপোল আক্রমণ ।
৬৮৭খ্রীস্টাব্দ- কুফার যুদ্ধ ।
৬৯১খ্রীস্টাব্দ- দের-উল-জালিকের যুদ্ধ ।
৭০০খ্রীস্টাব্দ- উত্তর আফ্রিকায় সামরিক ক্যাম্পেইন ।
৭০২খ্রীস্টাব্দ- দের-উল-জামিলার যুদ্ধ ।
৭১১খ্রীস্টাব্দ- স্পেন আক্রমণ
৭১২খ্রীস্টাব্দ- সিন্ধুর লড়াই ।
৭১৩খ্রীস্টাব্দ- মূলতানের লড়াই ।
৭১৬খ্রীস্টাব্দ- কনস্টানটিপোল দখল ।
৭৩২খ্রীস্টাব্দ- ফ্রান্সের যুদ্ধ ।
৭৪০খ্রীস্টাব্দ- নোবেলের যুদ্ধ ।
৭৪১খ্রীস্টাব্দ- উত্তর আফ্রিকায় বাগদুয়ারার যুদ্ধ ।
৭৪৪খ্রীস্টাব্দ- আইন আল জারের যুদ্ধ ।
৭৪৬খ্রীস্টাব্দ- ডুপার ঠাত্তার যুদ্ধ ।
৭৪৮খ্রীস্টাব্দ- রেয়'র যুদ্ধ ।
৭৪৯খ্রীস্টাব্দ- ইশফাহান এবং নিহাওয়ান্দের যুদ্ধ ।
৭৫০খ্রীস্টাব্দ- জ্াবের যুদ্ধ ।
৭৭২খ্রীস্টাব্দ- উত্তর আফ্রিকায় জানবির যুদ্ধ ।
৭৭৭খ্রীস্টাব্দ- স্পেনের সারাগোসার যুদ্ধ ।

অনুমতি পেয়ে হজরত মুয়াবিয়া সারা দেশে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে সৈনিক আহ্বান করলেন । জলযুদ্ধের প্রশিক্ষণ শুরু হলো । রাজধানীতে মানুষ দলে দলে সৈনিকের খাতায় নাম লেখানোর তোড়জোড় পড়ে গেল । কিছুদিনের মধ্যেই বিরাট শক্তিশালী নৌবহর গড়ে উঠলো । হজরত আবদুল্লাহ বিন-কায়েস আল হারেসির নেতৃত্বে আল্লাহর নাম নিয়ে, হিজরি আটাশ সনে মুসলিম বাহিনী সাইপ্রাস উপকূলে এসে পৌঁছে । গ্রিক নৌ-বাহিনীর সাথে পরদিন শুরু হলো ভয়াবহ যুদ্ধ । প্রথম দিনের যুদ্ধেই মুসলিম সেনাপতি আবদুল্লাহ বিন-কায়েস তীরবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হলেন । খবর পেয়ে মদিনায় খলিফা উসমান চিন্তিত হলেন । তাড়াতাড়ি মিশরের গভর্নর আবদুল্লাহ বিন সাদকে সাইপ্রাস অভিমুখে সৈন্য পাঠাতে নির্দেশ দেন । মিশর থেকে হজরত আবদুল্লাহ বিন সাদ সৈন্য নিয়ে আসার আগ পর্যন্ত মুসলিম বাহিনী আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ চালিয়ে গেল । অল্পদিন পরে মিশর ও সিরিয়ার সম্মিলিত নৌ-বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে গ্রিকবাহিনী পরাজয় বরণ করে । বুদ্ধিমান-বিচক্ষণ মুয়াবিয়া সাইপ্রাস অধিবাসীগণের ওপর জিজিয়া কর ধার্য না করে রাষ্ট্রের ওপর বার্ষিক ৭০ হাজার দিনার (স্বর্ণ মুদ্রা) কর আরোপ করেন । রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তাদের হাতে ছেড়ে দেন । মুয়াবিয়ার পরামর্শে হজরত আবদুল্লাহ বিন সাদ নৌবহর বোঝাই করে যুদ্ধলব্ধ মাল নিয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন । সেনাপতি আবদুল্লাহ বিন কায়েস অন্য একটি যুদ্ধে মারা যান । জীবিতকালে হজরত আবদুল্লাহ বিন কায়েস কমপক্ষে ৫০টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন ।

রাজ্য বিস্তারের সাথে সাথে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে যুদ্ধলব্ধ বাড়তি সম্পদও আসতে থাকলো। কিন্তু এই লুটের সম্পদ দেশের উন্নয়ন বা সাধারণ মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে ব্যবহার হলো না। ক্ষমতা ও সম্পদ দুটোই রইলো কোরায়েশদের হাতে। দিনদিন শাসক ও শোষিতের মধ্যকার বৈষম্য বাড়তেই থাকলো। বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্যের সীমান্ত এলাকায় সৈন্যগণ ধ্বংস ও লুটের কাজে লিপ্ত রইলো আর এদিকে রাজ্যের অভ্যন্তরে শাসকগণ ভোগবিলাসী জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠলো। সিরিয়ার গভর্নর মুয়াবিয়া যখন হজরত উসমানকে আর্মানিয়া আক্রমণ করতে পরামর্শ দেন, প্রায় একই সময়ে মিশরের আব্দুল্লাহ বিন সাদ ত্রিপলি (বর্তমানে লিবিয়ার রাজধানী) আক্রমণ করতে চেয়েছিলেন। আমর ইবনুল আসের সাথে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও দেশের অভ্যন্তরীণ গোলযোগে তাকে অপেক্ষা করতে হলো অনেকদিন। হজরত আব্দুল্লাহ বিন সাদ পুনরায় ত্রিপলি আক্রমণ করার প্রস্তুতি নেন এবং উসমানকে সৈন্য পাঠাতে অনুরোধ জানান। খলিফা হযরত উসমান মদিনা থেকে একদল বিশেষ যোদ্ধা ত্রিপলি অভিমুখে পাঠিয়ে দেন। দীর্ঘস্থায়ী এ যুদ্ধ ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ ও রক্তক্ষয়ী। এক পর্যায়ে রণভঙ্গ দিয়ে মুসলিম সৈন্যগণ যখন পশ্চাদগমনের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, ঠিক তখনই মদিনা থেকে আগত তেজস্বী বীর কোরায়েশ যোদ্ধা হজরত জোবায়ের, আবদুল্লাহ বিন সাদকে একটি মূল্যবান পরামর্শ দিলেন। তিনি বললেন : "মুসলিম বাহিনীর মধ্যে ঘোষণা করা হউক, যে ব্যক্তি ত্রিপলির গভর্নর গ্রিগেরিয়াসের মাথা কেটে আনতে পারবে, তাঁকে এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা ও সেই সাথে গ্রিগেরিয়াসের সুন্দরী যুবতী কন্যা দান করা হবে।" যেই ঘোষণা সেই কাজ। কিছুদিনের মধ্যেই গ্রিগেরিয়াসের মাথাটা দ্বিখণ্ডিত করে মুসলিম সেনাশিবিরে হাজির করা হলো। সাথে বন্দিনী সেই অনিন্দ্য সুন্দরী তরুণী গ্রিগেরিয়াসের বীরকন্যা, যিনি অস্ত্র হাতে সব সময় পিতার পাশে-পাশে থেকে যুদ্ধ করেছিলেন। এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার বণ্টনে মুসলিম সেনাপতির কোনো অসুবিধা হয়নি, সমস্যাটা হলো সেই মেয়েকে নিয়ে। একটিমাত্র মেয়ের দিকে হা করে তৃষ্ণার্থ চোখে তাকিয়ে আছে এক পাল কাম ক্ষুধার্ত সৈন্য। রাজকন্যা নিজেই সমস্যার সমাধান করে দিলেন। গ্রিগেরিয়াসের বীরকন্যা পরাধীনতার চেয়ে মৃত্যুকেই স্বেচ্ছায় বরণ করে নেন। কোনো মুসলিম সৈন্যের শয্যাসঙ্গিনী হওয়ার আগেই তিনি আত্মহত্যা করেন।

ত্রিপলি যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী যে বিপুল ধনরত্ন লাভ করেন, তা দেখে খলিফা উসমান (রাঃ) খুশিতে আত্মহারা হয়ে, বিজয়ী বীরনেতা আব্দুল্লাহ বিন সাদকে (রাঃ) 'বীর উত্তম' উপাধিতে ভূষিত করেন। ইতিপূর্বে কোনো যুদ্ধে এতো সম্পদ লাভ করা সম্ভব হয়নি। নিয়মানুযায়ী যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক পঞ্চমাংশ রাজস্ব খাতে জমা হওয়ার কথা। প্রফুল্লতায় বিভোর উসমান (রাঃ) এই বিপুল সম্পদের প্রায় সবটুকুই আবদুল্লাহ বিন সাদকে ও তাঁর নিজস্ব মন্ত্রী মারওয়ানকে দিয়ে দেন। তবে এ ছাড়া খলিফার কোন উপায়ও ছিল না। বাইতুলমাল শূন্য রাষ্ট্র-পরিচালনায় যখন উসমান (রাঃ) হিমশিম খাচ্ছিলেন, তখন আর্মানিয়া ও ত্রিপলি যুদ্ধই তাঁর ক্ষমতায় টিকে থাকার একমাত্র সহায় ছিল। তাই খলিফা নিজেই ত্রিপলির যুদ্ধপূর্বে আব্দুল্লাহ বিন সাদকে, যুদ্ধে জয়ী হলে এরূপ সম্পদ বণ্টনের অঙ্গীকার করেছিলেন। বিষয়টা জনগণ প্রসন্নচিত্তে মেনে নিতে পারলো না। উল্লেখ্য, আব্দুল্লাহ বিন সাদ ও মারওয়ান এরা দু-জনই ছিলেন উমাইয়া বংশীয় এবং খলিফা হজরত উসমানের (রাঃ) আত্মীয়। ত্রিপলি জয় করে মুসলিম সৈন্যদল আলজিরিয়া ও মরক্কো দখল করে নেয়। এবার মরক্কোর উত্তরে সমুদ্রের অপর পাড়ে ফুলে-ফলে ভরা শস্য-শ্যামলা তরুরাজি আচ্ছাদিত, লোভনীয় স্পেন ভূমির ওপর তাদের দৃষ্টি পড়লো। সংবাদ পেয়ে খলিফা উসমান লোভ সামলাতে পারলেন না। তড়িঘড়ি করে মদিনা থেকে একদল সৈন্যসহ আব্দুল্লাহ বিন নাফে বিন হাসিন ও আব্দুল্লাহ বিন নাফে বিন আবদে কায়েস নামক দুজন পরাক্রমশালী যোদ্ধাকে স্পেন অভিমুখে পাঠিয়ে দেন। কোরায়েশ মরু-দস্যুরা তখনো জল-দস্যুতার দক্ষতা অর্জন করতে পারেনি। তাই সমুদ্র-পাড়ে এসে তারা স্পেন দখলের আশা আপাতত ত্যাগ করতে বাধ্য হলো। আব্দুল্লাহ বিন সাদ যখন সাইপ্রাস উপকূলে জলযুদ্ধে ব্যস্ত, হজরত মুয়াবিয়া তখন স্থলযুদ্ধে কনস্টানটাইন দখল করতে বেরিয়ে পড়েন। কনস্টানটাইন দখল করতে মুয়াবিয়া (রাঃ) দু'বার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। কিন্তু ঐ বছরই তিনি আর্জরুম প্রদেশের অন্তর্গত হাস আল-মুরাত নামক এলাকাটি দখল করতে সক্ষম হন।

খলিফা উসমানের শাসনামলে মুসলিম সাম্রাজ্যের অন্যান্য প্রদেশের অবস্থা কেমন ছিল তা জানার লক্ষ্যে এবারে কুফা ও বসরার প্রতি একটু নজর দেয়া যাক। হজরত ওমরের (রাঃ) আমলে কুফার গভর্নর ছিলেন হজরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ)। খলিফা ওমর (রাঃ) মৃত্যুর পূর্বে একটি মহৎ কাজ করে গেলেন; সরকারি সম্পদের অপচয়কারী, চরম অমিতব্যয়ী মাত্রাতিরিক্ত সুখ-সম্ভোগ বিলাসী সাহাবি হজরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাসকে (রাঃ) কুফার গভর্নর পদ থেকে অপসারিত করে তাঁর স্থলে হজরত মুগিরা ইবনে শোবাকে (রাঃ) নিযুক্ত করেন। কিন্তু অভাগা সাধারণ কুফাবাসীর দুর্গতি দূর হলো না। হজরত মুগিরা ইবনে শোবা (রাঃ) অত্যন্ত রুক্ষ-কঠোর ঔদ্বত্য ও ক্রুদ্ধ স্বভাবের ছিলেন। তাঁর বৈষম্যমূলক অশ্লীল আচরণ, ব্যক্তিকেন্দ্রিক চরিত্র ও জনগণের প্রতি চরম অবজ্ঞার খবর খলিফা উসমানের কানে পৌঁছিলে তিনি অতিষ্ঠ হয়ে মুগিরা ইবনে শোবাকে (রাঃ) গভর্নর পদ থেকে বরখাস্ত করেন। কিন্তু জনগণকে হতাশ করে হজরত উসমান আবার সেই সুখ-সম্ভোগ বিলাসী সাহাবি হজরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাসকে (রাঃ) উক্ত পদে নিযুক্ত করেন। হজরত সাদ (রাঃ) সুযোগ বোঝে পূর্বের চেয়েও অধিক বিলাসী হয়ে উঠলেন। শুধু তা-ই নয়, এবারে তিনি বাইতুলমাল থেকে বিপুল পরিমাণের সরকারি অর্থ আত্মসাৎ করে বসলেন। তখন বায়তুলমালের কোষাধক্ষ্য ছিলেন সাহাবি হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)। উল্লেখ্য বর্তমান কুফার গভর্নর সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস ইসলাম পূর্ব মক্কায় আকাবা ইবনে আবু

মুইতের ছাগল রাখাল ছিলেন। বায়তুলমালের অর্থ নিয়ে গভর্নর ও কোষাধক্ষ্যের মধ্যে প্রবল মনোমালিন্য ও ঝগড়া হলো। একে অন্যের প্রতি গালাগালি, রূঢ় ব্যবহার এমন পর্যায়ে পৌঁছিল যে শেষ পর্যন্ত গভর্নরের বিরুদ্ধে টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ, খলিফা উসমানের দরবারে উপস্থাপিত করা হলো। বিচারে হজরত সাদ দোষী সাব্যস্থ হলেন। এবারে কুফার গভর্নর পদে যিনি নিযুক্ত হলেন, তিনি হলেন খলিফা উসমানের বৈপিত্রীয় ভাই, খ্যাতনামা বীর অলিদ ইবনে ওকবা (রাঃ)। আগুন ধরে গেল কোরায়েশ-হাশিমী গোত্রের গায়ে। কুফার নব-নিযুক্ত শাসনকর্তা অলিদ ইবনে উকবা ছিলেন নবীজি মুহাম্মদের (দঃ) প্রাণের শত্রু কবি উকবা বিন আবু মুয়াতের পুত্র। নবীজির সাথে একবার একটি ঘটনা কুফাবাসীর জানা ছিল : ৬২৪ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে বদরের যুদ্ধে মুসলিম সৈন্যদের হাতে উকবা বন্দী হয়ে ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য ভরা সুরে নবীজিকে প্রশ্ন করেছিলেন যে, তিনি (উকবা) মারা গেলে তাঁর সন্তানগণ কি খাবে? উত্তরে নবীজি বলেছিলেন, দোজখের আগুন! (দ্রষ্টব্য : মুসলিম শরিফ, চ্যাপ্টার ৩৮, বুক নম্বর ১৯ নম্বর ৪৪২১, ৪৪২২)। সেই উকবার ছেলে অলিদকে, অসৎ চরিত্রের লোক হিসেবে মানুষ আগে থেকেই জানতো। ক্রোধে, ঘৃণায় কুফাবাসী বারবার খলিফা উসমানের কাছে অভিযোগ করেও কোনো ফল পেলো না। অলিদের কঠোর দমননীতির সামনে সাধারণ মানুষ মাথানত করতে বাধ্য হলো। অন্যায়, অত্যাচার আর স্বেচ্ছাচারিতার চূড়ান্ত সীমায় এসে হজরত অলিদ (রাঃ) একদিন জনতার ফাঁদে ধরা পড়ে যান। মদ্যপানে অভ্যস্ত হজরত অলিদ (রাঃ) নেশাগ্রস্থ হয়ে একদিন এমনভাবে ঘুমিয়েছিলেন যে, কিছু লোক তাঁর হাতের আঙুল থেকে রাষ্ট্রীয় সীলযুক্ত একটি আংটি খুলে, অসৎ চরিত্রের প্রমাণস্বরূপ, মদিনায় খলিফার কাছে নিয়ে যায়। তাছাড়া তিনি একদিন নেশায় বিভোর হয়ে মসজিদে ইমামতির সময়ে ফজরের নামাজ, ফরজ দুই রাকাতের জায়গায় চার রাকাত পড়িয়েছেন বলেও তারা খলিফার কাছে অভিযোগ করে। এ নিয়ে সারা দেশে বিক্ষোভ ঠেকাতে খলিফা বাধ্য হয়ে হজরত অলিদকে পদচ্যুত করেন। এরপর থেকে হজরত অলিদ আর কোনোদিন খলিফা উসমানকে সুনজরে দেখেননি। এবার খলিফা উসমান কুফার মসনদে বসালেন কোরায়েশ বংশের তরুণ বীরযোদ্ধা হজরত সাইদ বিন আল আসকে। এই ব্যক্তির ভেতর কোরায়েশসুলভ অমানবিক, দুশ্চরিত্রের অভাব মোটেই ছিল না। কোরায়েশদের ঔদ্ধত্য, অহমিকা কুফাবাসীর জানা ছিল। আগের সকল শাসকের চেয়ে নতুন গভর্নর ভয়ানকরূপে প্রকাশ হলেন। তিনি স্থানীয় অমুসলিম তো দূরের কথা, অকোরায়েশ মুসলিমদেরকেও হীন মর্যাদার, পশুপ্রকৃতির বলে খলিফাকে পত্র দ্বারা অবহিত করলেন এবং বললেন, এদেরকে তিনি লৌহদণ্ড দিয়ে শায়েস্তা করবেন। তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা দিলেন, একমাত্র কোরায়েশবংশই সম্ভ্রান্ত, শালীন ও উচ্চমর্যাদার দাবি করতে পারে। একটি বৈঠকে সাইদ বিন আল আস যখন বললেন : 'সোয়াদ উপত্যকাটি একচেটিয়া কোরায়েশ বংশের লোকদের জন্য রক্ষিত' উপস্থিত জনগণ সমস্বরে প্রতিবাদ করে উঠলো। তারা বললো : এই বিশাল মুসলিম-সাম্রাজ্য বিস্তারে কুফা ও বসোরাবাসীর অবদান ভুলে গেলে কোরায়েশদের ভালো হবে না। সারা দেশ জুড়ে গণবিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়লো। মদিনায়, মিশরে, কুফায় সর্বত্র সরকারি গুরুত্বপূর্ণ পদে শুধুই উমাইয়া বংশের লোক। যে হাশিমি বংশে মুহাম্মদের (দঃ) জন্ম, যাঁর জন্ম না হলে ইসলাম জন্ম নিতো না, সেই হাশিমি গোত্র এমন আস্ফালন বরদাশত করবে কেন? তারা খলিফার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থার প্রস্তুতি নিতে থাকলো। এই বিক্ষোভের পরিপ্রেক্ষিতে হজরত উসমান (রাঃ) কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন তা আমরা যথাস্থানে আলোচনা করবো। ইত্যবসরে বসোরার একটু খোঁজ নেয়া যাক।

(৫)

ইসলামের ইতিহাসের দুই বিশেষ ব্যক্তিত্ব হজরত হাসান বসোরি (রাঃ) ও তাপসী হজরত রাবেয়া বসোরির (রাঃ) জন্মস্থান এই বসোরা। মুক্তবুদ্ধি চর্চার মুতাজিলা মতবাদও এই ইরাকের বসোরা হতে উদ্ভূত। রাজনৈতিক গুরুত্বের দিক দিয়ে কুফার পরেই বসোরার স্থান। কুফা ইরাকের উত্তরাঞ্চলের ও বসোরা দক্ষিণাঞ্চলের রাজধানী ছিল। বসোরার শাসনকর্তা এখান থেকে দক্ষিণ পারস্য, বেলুচিস্তান ও মধ্য এশিয়া পর্যন্ত শাসন চালাতেন। কুয়েতের দক্ষিণাঞ্চলও বসোরার শাসনাধীন ছিল। হিজরি ২৪ সনে হজরত ওমর (রাঃ) সাহাবি হজরত আবু মুসা-আশআরিকে (রাঃ) বসোরার গভর্নর নিযুক্ত করেন। একনাগাড়ে বহুদিন অন্যায়ভাবে ক্ষমতার অপব্যবহার করে আবু মুসা-আশআরি হয়ে ওঠেন এক ভয়ানক আত্মম্ভরী স্বৈরশাসক। একটি এলাকা দখলের প্রস্তুতিকল্পে আবু মুসা-আশআরি মসজিদে জেহাদের ফজিলত বর্ণনাকালে বলেছিলেন যে, পায়ে হেঁটে জেহাদের ময়দানে গেলে প্রচুর সোয়াব অর্জন করা যায়। লোকে বললো, তাঁর কথায় মিথ্যাচার আর হটকারিতা আছে। পরদিন ভোর বেলা অবাক বিস্ময়ে সাধারণ জেহাদিগণ প্রত্যক্ষ করলো, গভর্নর আবু মুসা-আশআরি (রাঃ) রাজকীয় পোষাকে তেজী ঘোড়ায় চড়ে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে আসছেন। চল্লিশটি গাধা তাঁর যুদ্ধ-সরঞ্জাম বহন করছে। কিছু লোক তাঁর পথ রুখে দাঁড়ালো। আবু মুসা আশআরি (রাঃ) ঐ লোকদের নীচ, হীনমনা, বদজাত বলে ধমকালেন এবং তাদেরকে কঠোর শাস্তির হুমকি দিলেন। পূর্বে তাঁর অসীম ক্ষমতার অহমিকা ও স্বেচ্ছাচারিতায় অতিষ্ট হয়ে জনগণ বিদ্রোহ করে বারবার ব্যর্থ হয়েছে। আবু মুসা (রাঃ) তাঁর আত্মীয়স্বজনদেরকে অত্যাধিক সুযোগ-সুবিধা দিয়ে রাষ্ট্রকে, সুবিধা প্রাপ্ত ও সুবিধা বঞ্চিত এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করে ফেলেন। সুবিধা বঞ্চিত দল সংগঠিত হতে থাকে এবং এক পর্যায়ে মদিনা পর্যন্ত তাদের বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। একটি নিশ্চিত গৃহযুদ্ধের লক্ষণ টের পেয়ে খলিফা উসমান (রাঃ) হিজরি ২৯ সনে, আবু মুসা-আশআরিকে (রাঃ) গভর্নর পদ থেকে বরখাস্ত করেন। গৃহযুদ্ধ ঠেকানো গেল কিন্তু বসোরাবাসীর দুঃখ দূর

হলো না। এবারে বসোরার ক্ষমতায় বসলেন খলিফা উসমানের (রাঃ) মামাতো ভাই হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমির। এই লোকটি খালিদ বিন ওয়ালিদ ও আমর ইবনুল আসের চেয়েও ভয়ঙ্কর দুর্ধর্ষ ছিলেন। ক্ষমতায় বসেই তিনি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অ-কোরায়েশদের অধিকার নিষিদ্ধ করে দেন। আব্দুল্লাহ ইবনে আমির ভীষণ প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁর অমানবিক কঠোর শাসননীতি সাধারণ মানুষের মনে ত্রাসের সৃষ্টি করে। ধীরে ধীরে সমগ্র মুসলিমজগত দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। কোরায়েশ বনাম অকোরায়েশ। একদিকে যেমন খলিফা উসমানের (রাঃ) রাজ্য-বিস্তার, বিভিন্ন দেশ-এলাকা দখল ও দখলকৃত এলাকায় বিদ্রোহ দমনকার্য চলতে থাকলো, অপরদিকে দেশের অভ্যন্তরে, হজরত উসমানের ক্ষমতাসীন উমাইয়াদের বিরুদ্ধে মুহাম্মদের (দঃ) হাশিমি বংশ, আরবদের বিরুদ্ধে অনারব, কোরায়েশদের বিরুদ্ধে অকোরায়েশ, শাসকের বিরুদ্ধে শোষিতের বেঁচে থাকার সংগ্রাম অব্যাহত রইলো।

হজরত উসমান কর্তৃক এ যাবৎ মিশর, কুফা ও বসোরার ক্ষমতাচ্যুত শাসকগণ যখন দলবদ্ধ হয়ে খলিফাকে ক্ষমতাচ্যুত করার পরিকল্পনা করেন, উসমান (রাঃ) তখন বৃদ্ধ বয়সে ক্ষমতায় আরো কিছুদিন টিকে থাকার লক্ষ্যে, কোরান সংকলনের উদ্যোগ নেন। সেই ওমরের (রাঃ) খুনী পুত্রের বিচার থেকে আজ পর্যন্ত প্রজাগণ খলিফা উসমানের রাষ্ট্র পরিচালনায় কোরানের শরিয়া আইন অনুসরণের উদাহরণ দেখেনি। সুতরাং সঙ্গত কারণেই সাধারণ মানুষ খলিফার কোরান সংকলনের উদ্যোগে সন্দিহান না হয়ে পারলো না। তবে হজরত উসমান তাঁর সৎভাই, মিশরের অধিপতি, 'আল্লাহর বাণী' কোরানের অলৌকিকত্বে অবিশ্বাসী আবদুল্লাহ বিন সাদ বিন আবি সারাহকে (রাঃ) কোরান সংকলন কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করলেন না।

নবী মুহাম্মদ (দঃ) লিখতেও পারতেন, পড়তেও পারতেন; হাদিসে এর যথেষ্ট প্রমাণ আছে।[১৪] কিন্তু নিজে হয়তো কোরান লেখেন নাই। ঐ সময়ের একটা রেওয়াজ প্রচলিত ছিল বড় বড় কবিরা নিজেরা তাদের কবিতা লিখতেন না, বরং অনুগত-অনুসারী এবং অন্য পেশাদার কবির মাধ্যমে নিজেদের কবিতা-বক্তব্য লিখিয়ে নিতেন, তাদের দিয়ে মুখস্ত করাতেন, ঘনঘন পুনরাবৃত্তি করাতেন, যা বংশ পরম্পরায় টিকে থাকতো; যেমন প্রাক-ইসলামি যুগের বিখ্যাত কবি ধু-রামা (মৃত ৬৩৮) নিজে লিখতে-পড়তে জানতেন না বলে জানা যায়, কিন্তু রাবীরা (নিয়োগকৃত পেশাদার কবি) তাঁর কাছ থেকে মুখে শুনে-শুনে কবিতা মুখস্ত করে নিতেন এবং সেই কবিতা বংশপরম্পরায় ছড়িয়ে দিয়েছেন। নবী মুহাম্মদও নিজে না লিখে তাঁর মুখনিঃসৃত কথা-কবিতা-বক্তব্য 'স্বর্গীয় বাণী' বলে দাবি করতেন, তাই তার অনুগত-অনুসারী উপস্থিত শ্রোতা যে যেভাবে পারেন স্মরণ রাখার চেষ্টা করতেন। কেউ কেউ তাঁর কথা পাথরে, খেজুর পাতায়, গাছের পাতা থেকে বিশেষভাবে তৈরি কাগজে, পশুর চামড়ায় ও কাঠের টুকরোয় লিখে রাখতেন (কাতিব), এমনকি অনেকেই মুখস্তও করে রাখতেন (হাফেজ)। তৌরাত, জবুর ও ইঞ্জিল কেতাব অনুসারী এবং হানিফদের কাছ থেকে নানা সময়ে মুহাম্মদের (দঃ) শুনা ঘটনাবলী ও মুহাম্মদের (দঃ) কাছ থেকে মানুষের ঐ শুনা কথা, বিভিন্ন বস্তুতে বিক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্নভাবে লিখিত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বাক্যসমূহই পবিত্র কেতাব 'আল-কোরান'। কোরান রচনায় মুহাম্মদকে (দঃ) যারা সাহায্য করেছিলেন তাদের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। কোরানের কাব্যিক ছন্দ, শব্দ-বিন্যাস, এবং একেশ্বরবাদের ধারণা পর্যন্ত তৎকালীন এবং ইসলাম পূর্ববর্তী আরবিয় একাধিক কবি-সাহিত্যিক ও হানিফ মতাবলম্বী, ইহুদি-খ্রিস্টানদের কাছ থেকে ধারকৃত; তা তৎকালীন আরববাসী অনেকেই জানতেন। শুধু কোরানের বক্তব্যে মুগ্ধ হয়ে, আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করে নিজেদের পূর্বপুরুষের ধর্মবিশ্বাস ত্যাগ করে দলে দলে অভাবী-নিরন্ন মানুষেরা ইসলাম গ্রহণ করেনি। কোরানের থেকেও চমৎকার লোককাহিনী, উপদেশ, নীতিমালা, বিভিন্ন ধরনের একেশ্বরবাদী ধ্যানধারণা, মনোহর কাব্য-সাহিত্য সারা আরব জুড়েই ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল; এগুলোকে ব্যাপকভাবে গ্রহণ না করে পিতৃপুরুষের ইতিহাস-ঐতিহ্য-লোকাচার ত্যাগ করে দলে দলে 'শান্তিবাদী' ইসলাম গ্রহণ করার অবশ্যই 'ভিন্ন কারণ' রয়েছে। সমালোচকেরা ইতিহাস থেকে বিভিন্ন ঘটনা তুলে ধরে উল্লেখযোগ্য 'ভিন্ন কারণ'গুলো চিহ্নিত করেছেন : 'তরবারির জোর' আর 'যুদ্ধলব্ধ নারী-সম্পদের ভাগ পাওয়া'। এ 'ভিন্নকারণ' নিয়ে অনেকের ভিন্নমত থাকতেই পারে; তবে আমরা সে আলোচনায় যাচ্ছি না। এখানে আমরা পূর্ববর্তী বক্তব্যের রেশ ধরে সংক্ষিপ্ত পরিসরে ইসলামপূর্ব আরবের বিখ্যাত কবি ইমরুল কায়েসের কবিতার সাথে কোরানের আয়াতের সংমিশ্রণ নিয়ে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করতে পারি[১৫] : খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী কিন্দার রাজপরিবারের যুবরাজ ইমরুল কায়েস (মৃত সম্ভব্য ৫৪০ খ্রিস্টাব্দ) প্রাক-ইসলামি যুগের আরবের শ্রেষ্ঠ সাতজন কবিদের একজন। আরবের অত্যন্ত উত্তম গীতিকাব্য 'মোয়াল্লাকাত' (ঝুলন্ত)-এর লেখক। মোয়াল্লাকাত হচ্ছে ষাট থেকে একশো পয়ার ছন্দে রচিত গীতিকবিতা। ওকাজের মেলার কবিতা উৎসবে বিচারকেরা গুণ অনুসারে বিচার করে বিজয়ী শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতা পুরস্কার হিসেবে মিশরের দামী লিনেন কাপড়ের ওপর সোনার অক্ষরে খোদাই করে ৩৬০ দেবতার ঘর 'কাবা'র দরজায় ঝুলিয়ে রাখা হতো। সেখান থেকেই বিজয়ী গীতিকবিতার (কাসিদা) নাম হয়েছে 'ঝুলন্ত' (মোয়াল্লাকাত) কবিতা। ইমরুল কায়েসের কবিতাও ওকাজ মেলায় বিজয়ী হয়ে

[১৪] প্রথম অধ্যায়ের 'মুহম্মদ (দঃ)সত্যই কি নিরক্ষর ছিলেন?' শীর্ষক অংশ দ্রষ্টব্য।

[১৫] Ibn Warraq (Editior), *The Origins of the Koran*, Prometheus Books, New York, USA, 1998, page 235-236.

কাবাঘরের দরজায় শোভিত হয়েছে দীর্ঘদিন। মূল প্রসঙ্গে যাই, মুহাম্মদের জন্ম ও ইসলাম আভির্ভাবের বেশ আগেই কবি ইমরুল কায়েস মারা যান; তবে তাঁর জনপ্রিয় ধর্মীয় ভক্তিমূলক কবিতাগুচ্ছ সারা আরববাসীর মুখে মুখেই প্রচলিত ছিল। একবার নবীজির কনিষ্ঠ কন্যা হজরত ফাতিমা কোরানের (৫৪ নম্বর) সুরা 'কমর' (চাঁদ)-এর আয়াত 'কিয়ামত আসন্ন, আর চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে...' বারে-বারে আবৃত্তিকালে কবি ইমরুল কায়েসের মেয়ে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কি বলছো, ফাতিমা? ফাতিমা জবাব দিলেন, 'আল্লাহর ওহি' কোরানের আয়াত পাঠ করছেন। কায়েসের মেয়ে রাগান্বিত হয়ে বললেন : "সর্বনাশ! এ তো আমার বাবার লেখা কবিতার একটি পংক্তি। তোমার বাবা দেখি আমার বাবার কবিতা নকল করে বেহেস্ত থেকে আগত 'আল্লাহর বাণী' বলে কোরানে ঢুকিয়ে দিয়েছেন!" ফাতিমা এবং ইমরুল কায়েসের মেয়ের এই ঘটনাটি এখন পর্যন্ত সারা আরব জুড়ে ব্যাপকভাবে প্রচলিত।[১৬] তা মুহাম্মদ (দঃ) কখন-কিভাবে ইমরুল কায়েসের ঐ কবিতা সংগ্রহ করেছিলেন তা আমাদের এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়। তবে মুসলমানরা যখন দাবি করেন, 'আল্লাহর বক্তব্যই কোরান', তখন বলতে ইচ্ছে করে মুহাম্মদ (দঃ) নয়, আল্লাহই নিশ্চয়ই তাহলে ইমরুল কায়েসের কবিতার পংক্তি নকল করে কোরানের আয়াত বলে চালিয়ে দিয়েছেন! এ প্রসঙ্গে '*The Origins of Islam*' নামক বিখ্যাত রচনার লেখক W. St. Clair-Tisdall-এর বক্তব্য তুলে ধরছি :

> "The connection between the poetry of Imra'ul Qays and the Koran is so obvious that the Muslims cannot but hold that they existed with the latter in the Heavenly table from all eternity! What then will he answer? That the words were taken from the Koran and entered in the poem?—an impossibility. Or that their writer was not really Imra'ul Qays, but some other who, after the appearance of the Koran, had the audacity to quote them there as they now appear?—rather a difficult thing to prove!" (দ্রষ্টব্য : *The Origins of the Koran*, page 236)।

কথিত আছে, খলিফা হযরত ওমর ও হযরত আলি ইমরুল কায়েসের কাব্য প্রতিভা এবং মৌলিকত্বের প্রশংসা করলেও নবীজি আরবের এই শ্রেষ্ঠ কবিকে 'নরকাগ্নির নেতা' বলেও অভিহিত করেছেন।[১৭] ইমরুল কায়েসকে নিয়ে মুহাম্মদের (দঃ) এরকম তীব্র ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়ার কারণ বুঝতে নিশ্চয়ই আমাদের 'রকেট সায়েনটিস্ট' হতে হবে না! কায়েসের মেয়ের কাছে এভাবে হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেলে মাথা কী ঠাণ্ডা রাখা যায়! যাহোক, হাদিস থেকে জানা যায়, গ্রন্থাকারে কোরানকে সংকলিত করার ধারণাটা প্রথম আসে হজরত ওমরের মাথায়। হজরত ওমর খলিফা আবু বকরকে এ ব্যাপারে প্রস্তাব দিলে আবু বকর প্রথমে রাজি হননি। (দ্রষ্টব্য : বোখারি শরিফ, ভলিউম ৬, বুক ৬১, নম্বর ৫০৯)। আবু বকর (রাঃ) জানতেন বিষয়টা স্পর্শকাতর ও কষ্টসাধ্য ব্যাপার। খলিফা উসমান যখন পুনরায় এ উদ্যোগটা নিলেন, তখন খোঁজ নিয়ে দেখা গেল, সিরিয়া, কুফা, বসোরা, আজারবাইজান, মিশরসহ বিভিন্ন এলাকার কোরান আর মদিনায় হজরত ওমরের নির্দেশে তৈরি, তাঁর মেয়ে হাফসার কাছে গচ্ছিত কোরানের মধ্যে বিস্তর তফাৎ। স্বেচ্ছাচারী, স্বৈরাচারী, জগতজুড়ে মুসলমানদের একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারের উচ্চাবিলাসী কোরায়েশ শাসকগণ তাঁদের প্রজা নির্যাতন, অপশাসন ও শোষণের বৈধতা যখন কোরানিক নির্দেশ বলে দাবি করতেন, তখন নির্যাতিত শোষিতেরাও একই কোরান দিয়েই প্রমাণ করার চেষ্টা করতেন শাসকেরা তাদের স্বার্থানুযায়ী কোরানে পরিবর্তন-পরিবর্ধন এনেছে এবং তাঁরা কোরানের ভুল ব্যাখ্যা করছেন। সাহাবি হজরত আবু জওহর গিফ্‌ফারি (রাঃ) সিরিয়ার স্বৈরশাসক হজরত মুয়াবিয়াকে সরাসরি 'কোরান-বিরোধী শাসক' বলে অভিযোগ করেন। আবু জওহর কোরানের উদ্ধৃতি দিয়ে বললেন : 'আপনি যে জনগণের সম্পদ দিয়ে রাজপ্রাসাদ গড়ে তুলেছেন এবং রাজকীয় বেশে বিলাসবহুল জীবন কাটাচ্ছেন তা কোরানের পরিপন্থি।' মুয়াবিয়া (রাঃ) আবু জওহর গিফ্‌ফারীকে (রাঃ) ধমক দিয়ে বললেন : 'বেকুবের দল, রাষ্ট্রীয় আয় ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদের মালিক জনগণ নয়। সকল সম্পদের মালিক একমাত্র আল্লাহ এবং আল্লাহই আমাকে তাঁর সম্পদের রক্ষক হিসেবে মনোনীত খলিফা করেছেন। সম্পদ ব্যবহার হবে জনগণের নয়, খলিফার ইচ্ছানুযায়ী।'

জনগণের কাছে যখন সারা মুসলিম সাম্রাজ্যের সকল প্রাদেশিক গভর্নরসহ স্বয়ং খলিফা উসমান কোরান-বিরোধী, অনৈসলামিক শাসক বলে বিবেচিত, তখন হজরত উসমানের কোরান সংকলন মানুষের কাছে কতটুকু সমাদৃত হবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। হজরত উসমান মদিনার খাজরাজ গোত্রের অ-কোরায়েশ জায়েদ বিন হারিথকে সর্বপ্রধান করে আব্দুল্লাহ ইবনে আল-জুবায়ের, সাদ বিন আল আস এবং আব্দুর রহমান বিন আল-হারিথ বিন হিশামসহ ১২ সদস্য (আনাস বিন মালিক, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, ওবেই ইবনে ক্বাব প্রমুখ) বিশিষ্ট একটি কোরান সংকলন কমিটি গঠন করলেন। নির্দেশ দিলেন মদিনার 'ওহি' লেখকদের সাথে যদি ভাষাগত মতানৈক্য দেখা দেয় তাহলে কমিটি যেন কোরায়েশদের ভাষা অনুসরণ করে। খলিফা আরো বললেন : 'এই কমিটি কর্তৃক

[১৬] এ প্রসঙ্গে মুক্তমনায় প্রকাশিত আবুল কাশেমের গবেষণালব্ধ প্রবন্ধ '*Who Authored the Qur'an?—an Enquiry*' পড়া যেতে পারে। প্রবন্ধটিতে জনাব কাশেম কোরান শরিফের প্রথম দিককার কিছু সুরার সাথে ইমরুল কায়েসের কবিতার অভূতপূর্ব মিল দেখিয়েছেন।

[১৭] আর. এ. নিকলসন, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস*, মল্লিক ব্রাদার্স, কলকাতা, ২০০৩, পৃষ্ঠা ১০৬।

প্রণীত কোরানই হবে সরকার অনুমোদিত পরিপূর্ণ বৈধ কোরান এবং রাজ্যের অন্যান্য সকল কোরান অবৈধ বলে গণ্য হবে।' কোরানকে রাষ্ট্রীয়ভাবে লেখা ও সম্পাদনা হলো। হজরত উসমান কমিটিকে কোরানের ৭টি কপি তৈরি করতে আদেশ দিলেন। ৭টি রাজ্যে কোরানের ৭টি কপি পাঠিয়ে তখনকার প্রচলিত বাকি সব কপি আগুনে পুড়িয়ে ফেলার হুকুম দিলেন। বেসরকারিভাবে প্রচলিত সকল কোরান পুড়িয়ে ফেলা হলো। এবারে আরব-অনারব, হাশিমি-উমাইয়া, কোরায়েশ-অকোরায়েশ নয়, রাজ্যের সকল প্রদেশের সকল এলাকা থেকে, সকল সমাজের সর্বস্তরের মানুষ, খলিফার বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠলো। খলিফা উসমান ১২টি বছর খেলাফত কালের পূর্ণ ১০টি বছর যুদ্ধবিগ্রহ করে কাটিয়েছেন। অন্যায়ভাবে বিরাট ভূখণ্ড দখল করা হলো, যশ-মান-পদোন্নতি-জগতের অফুরন্ত ধন-ভাণ্ডার-সম্পদ- দাস-দাসী সবই পদানত করা হলো। তবু হায়! অগণিত নিরপরাধ নারী-পুরুষ, শিশু-কিশোরের প্রাণ সংহার করে, এতো মানবরক্ত পান করেও তার পিপাসা নিবারণ হলো না। ইসলাম এবার নিজেরই রক্তপান করতে উদ্যোত হলো। রাজ্যের সকল এলাকা থেকে সরকার-বিরোধী সংগঠন গড়ে উঠলো। তাদের এক দফা, এক দাবি : স্বৈরশাসনের পতন হউক। সর্বদলীয় সংগ্রামের নেতৃত্বে যারা এগিয়ে আসলেন তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিচে দেয়া হলো :

হজরত মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর (রাঃ) : মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ছিলেন ইসলামের প্রথম খলিফা নবী মুহাম্মদের অতি প্রিয়ভাজন সাহাবি হজরত আবু বকরের কনিষ্ঠ পুত্র এবং নবী মুহাম্মদের কনিষ্ঠ স্ত্রী আয়েশার ভাই। প্রথম খলিফা আবু বকরের (রাঃ) মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা স্ত্রী, শিশু পুত্র মুহাম্মদকে নিয়ে হজরত আলিকে বিয়ে করেন। আবু বকরের স্নেহের সন্তান মুহাম্মদ ছিলেন যথেষ্ট জ্ঞানবুদ্ধি ও বিচক্ষণতার অধিকারী। হজরত আলির পোষ্যপুত্র মুহাম্মদ, তৃতীয় খলিফা নির্বাচনে, হজরত ওমরের নির্বাচন কমিটির ওপর চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ করেছিলেন। উসমানের (রাঃ) খেলাফত লাভের পরপরই তাঁর অদক্ষ রাষ্ট্রপরিচালনা, অন্যায় শাসন সহ্য করতে না পেরে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর (রাঃ) মদিনা ছেড়ে মিশর চলে যান।

হজরত মুহাম্মদ ইবনে আবু হুজাইফা (রাঃ) : রসুল মুহাম্মদের (দঃ) বিশেষ সম্মানিত সাহাবি হজরত আবু হুজাইফার (রাঃ) পুত্রের নামও 'মুহাম্মদ'। তাঁর পিতা ইয়ামামার যুদ্ধে (আবু বকরের আমলে) মৃত্যুবরণ করার পর থেকে তিনি খলিফা উসমানেরই গৃহে প্রতিপালিত হতে থাকেন। বড় হয়ে মুহাম্মদ ইবনে আবু হুজাইফা বুঝতে পারলেন, ইসলাম প্রচারের নামে জগত জুড়ে যে অত্যাচার-অনাচার চলছে তা কোনোভাবেই ধর্ম-সমর্থিত হতে পারে না। স্বদেশ ত্যাগ করে মুহাম্মদ ইবনে আবু হুজাইফা (রাঃ) মিশরে চলে আসেন। মিশরের আদিম অধিবাসী 'কীবতি সম্প্রদায়' কোরায়েশদের প্রভুত্ব সহ্য করতে পারতো না। মুহাম্মদ ইবনে আবু হুজাইফা মিশরের নির্যাতিত নিপিড়িত মানুষের পাশে এসে দাঁড়ালেন। তিনি মিশরের গভর্নর আব্দুল্লাহ বিন সাদ বিন আবি সারাহর দিকে ইঙ্গিত করে, চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন শাসকদের বিলাসিতাপ্রিয় আসল চেহারা। মিশরে এসে 'মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর' ও 'মুহাম্মদ ইবনে আবু হুজাইফা' নামের দুই মুহাম্মদ, সুদীর্ঘ ১২টি বছর অন্যায়ের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলতে থাকেন।

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা : হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা বিলাসবহুল জীবন ঘৃণা করতেন। ক্ষমতা ও অর্থের প্রতি তাঁর কোনো লোভ ছিল না। তিনি হজরত আলিকে ভীষণ শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল হজরত আলির ভেতর নবী মুহাম্মদের সকল প্রকার গুণাবলী বিদ্যমান বিধায় নবীর মৃত্যুর পর হজরত আলিই প্রথম খলিফা হবেন। পরপর তিনজন খলিফা জবরদস্তি ও অন্যায়ভাবে ক্ষমতা দখল করেছেন। বসোরায় আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা তাঁর এই বিশ্বাসের পক্ষে প্রচারণা করতে থাকেন। বসোরার গভর্নর আব্দুল্লাহ বিন আমির, আব্দুল্লাহ ইবনে সাবাকে তার দেশ থেকে বহিস্কার করে দেন। আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা কুফায় চলে যান। সেখানে আগে থেকেই হজরত আলির বহু সমর্থক ছিল। বসোরা ও কুফায় তাঁর বিশ্বাসের প্রতি প্রচুর লোক সমর্থন জানায়। অতঃপর আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা সিরিয়া গমন করেন। সিরিয়ায় তখন হজরত উসমানের উমাইয়া বংশীয় সরকার হজরত মুয়াবিয়ার যাঁতাকলে, হাশিমি বংশের শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা। পরিশেষে সিরিয়া ত্যাগ করে আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা মিশরে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ও মুহাম্মদ ইবনে আবু হুজাইফার সাথে মিলিত হন। এখানে তিনি 'সাবায়ি' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত করেন।

সারা মুসলিম বিশ্বে যে স্বৈরাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে প্রজাদের বিদ্রোহ তীব্র আকার ধারণ করেছে, হজরত আলি তা আঁচ করতে পেরে খলিফা উসমানকে কতগুলি সূক্ষ্ম পরামর্শ দিলেন। ক্ষমতা ও সম্পদের লোভে মানুষ যে কতো অন্ধ হতে পারে ৮০ বছর বয়স্ক হজরত উসমান তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তিনি হযরত আলির পরামর্শ গ্রাহ্য তো করলেনই না বরং বিদ্রোহের প্ররোচণাকারী বলে হজরত আলিকে অপবাদ দিলেন। দেশের পরিস্থিতি দিন দিন খারাপ হতে থাকে। সমগ্র দেশটা গণ-আন্দোলনের বিস্ফোরণ অবস্থায় দেখেও হঠাৎ করেই হজরত উসমান নতুন একটি প্রথার উদ্ভব ঘটালেন : 'প্রজাস্বত্বের হস্তান্তর, জায়গিরদারি ও জমিদারি প্রথা।' দুটি উদ্দেশ্যে হজরত উসমান এ কাজটি করেছিলেন যথা : (এক) স্বগোত্রীয় বিত্তশালী লোকদের সমর্থন অর্জন; (দুই) গরিব প্রজাদেরকে নিঃস্ব

থেকে নিঃস্বতর, আর কৃষকদেরকে ভূমিহীনকরণ। তাঁর ধ্বংসমুখী আইনের পক্ষে যুক্তি দাঁড় করালেন এই বলে, 'দেশে মাত্রাতিরিক্তভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। অভিজাত শ্রেণীর তুলনায় নিম্নশ্রেণীর লোকের সংখ্যা বেশি হয়ে যাচ্ছে এবং এর ফলে নাগরিক সভ্যতা ও শালীনতা বিপর্যয়ের সম্মুখীন। দেশে নবাগত মুসলিম অধিবাসীদের বেশিরভাগই যাযাবর-বেদুইন কিংবা গ্রাম্য অনারব। এরা মূর্খ ও বর্বর। এদের রুচি-আচরণ কদর্য, অভদ্র ভাষা, অসভ্য ব্যবহার ও রীতিনীতি ঔদ্বত্যপূর্ণ। এদের দ্বারা দেশের শান্তি বিপন্ন হচ্ছে।' আসলে এ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল ক্রমাগত যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে। ধর্ম প্রচারের নামে খুন, লুট, ডাকাতিকে আরবগণ পেশা হিসেবে গ্রহণ করে নেয়। ডাকাতি শুধু লাভজনক একটি বৈধ ব্যবসাই নয়, পূণ্য কাজ বলেও শাসকগণ প্রচারণা করতেন। সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার উপায় হিসেবে ইসলাম ধর্ম কবুল করে দস্যুতা গ্রহণ ছাড়া কোনো গতি ছিল না। সমাজের সর্বস্তরের মানুষ দলে দলে মুসলমান হলো, সৈনিক দলে যোগদান করে লুটকৃত সম্পদের অংশীদার হলো, সাথে নিয়ে আসলো কুসংস্কার, বিশৃঙ্খলা, অশ্লীলতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, অজ্ঞতা ও অরাজকতা। তাছাড়া ক্ষমতাশীল, বিত্তবান সাহাবিগণের যৌনক্ষুধা নিবারণের লক্ষ্যে গনিমতের মাল হিসেবে রক্ষিতা, যুদ্ধবন্দী নারীগণ, তাঁদের গর্ভজাত জারজ-সন্তানাদি সমাজ ও শাসকদের জন্য উপদ্রব হয়ে দাঁড়ায়।

খলিফা উসমানের 'প্রজাস্বত্বের হস্তান্তর, জায়গিরদারি ও জমিদারি প্রথা' নৈতিকতার চরম অবক্ষয়ে নিমজ্জিত একটা জাতিকে নিশ্চিত ধ্বংস থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে চালু করা হয় নাই, সে কথা বুঝতে কারো বাকি রইলো না। বেশ কয়েকজন সাহাবি এর প্রতিবাদ করলেন। প্রাক্তন বিশিষ্ট সাহাবিগণ অভিমত প্রকাশ করলেন, শরিয়ত-বিরোধী এ সরকারকে উৎখাত করতে না পারলে মুসলিম জাতি ধ্বংস হয়ে যাবে এবং সর্বোপরি ইসলাম দুনিয়া থেকে বিলীন হয়ে যাবে। এবারে নবীজির আমলের খ্যাতনামা সাহাবি দেশের বরেণ্য উলামাগণ বিদ্রোহী দলে যোগ দিলেন। এমনকি এককালে উসমানের 'ডান হাত' বলে পরিচিত হজরত তালহা, হজরত জুবায়ের, কুফার কোষাধ্যক্ষ সাহাবি ইবনে মাসউদসহ বহুসংখ্যক সাহাবি ও সরকারি কর্মচারী খলিফার বিরুদ্ধে চলে যান। হজরত উসমান কঠোর দমননীতি অনুসরণ করলেন। কয়েকজন সাহাবিকে দেশ থেকে বিতাড়িত করে দেন, কিছু লোককে প্রসাদে ডেকে এনে স্বহস্তে অমানুষিক নির্মম শাস্তি প্রদান করেন। বিদ্রোহীদের প্রতি হজরত উসমানের ভাষা ছিল অত্যন্ত অশ্লীল, অকথ্য, অমার্জিত। হজরত আলিও উসমানের অকথ্য ভাষায় গালাগালি থেকে রেহাই পাননি। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, সাহাবি হজরত আব্দুর রহমান বিন আউফ (রাঃ) যিনি হজরত ওমর কর্তৃক খলিফা নির্বাচন কমিটির প্রধান হয়ে মিথ্যা প্রবঞ্চণার মাধ্যমে উসমানকে খলিফা নির্বাচিত করেছিলেন, সাহাবি হজরত জায়েদ বিন থাবিত যাঁকে উসমান তাঁর 'কোরান সংকলন কমিটি'র প্রধান বানিয়েছিলেন, সাহাবি হজরত আমর ইবনুল আস, যাঁর কথায় উসমান (রাঃ) হজরত ওমরের খুনী পুত্র উবায়দুল্লাহকে বিনা শাস্তিতে মুক্ত করে দিয়েছিলেন, এঁরাসহ হজরত আলি বিদ্রোহী দলের প্রথম সারিতে এসে অবস্থান নেন। গ্রাম থেকে শহর, শহর থেকে রাজধানী সর্বত্র বিক্ষোভের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। অবস্থা বেগতিক দেখে সিরিয়ার গভর্নর মুয়াবিয়া খলিফাকে বার্তা পাঠালেন : "আমিরুল মোমেনিন, আপনি অতিসত্তর সিরিয়া চলে আসুন, মদিনায় আপনার প্রাণের নিরাপত্তা আর নেই, নতুবা সামরিক আইন জারি করুন, আমি সৈন্য দিয়ে সাহায্য করবো।" খলিফা কোনোটাই করলেন না। গণঅভ্যুত্থানের হাওয়ায় মদিনা উত্তপ্ত। উসমান টের পেলেন বিপদ আসন্ন। তিনি হজরত আলির স্মরণাপন্ন হলেন। হজরত আলিকে ডেকে এনে উসমান (রাঃ) নিজের ভুল স্বীকার করলেন। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। আসলে কিন্তু ভুল স্বীকার করেননি। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের লক্ষ্যে হজরত আলিকে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। উসমান বললেন : "আলি এখন থেকে আমি শুধু তোমার কথাই শুনবো। মুয়াবিয়া, মারওয়ানের পরামর্শ নেয়া আমার ঠিক হয়নি। আজ থেকে তুমি যেভাবে বলবে রাষ্ট্র সেভাবে চলবে।" আলির মনে পড়লো ক্ষমতা ও সম্পদ লোভী, আত্মম্ভরী, স্বেচ্ছাচারী উসমানের সুদীর্ঘ ১২ বছর শাসনের কলঙ্কিত দিনগুলোর কথা, খলিফা উসমান তিনটি নিরপরাধ মানুষের খুনী সাহাবি হজরত ওমরের পুত্র হজরত ওবায়দুল্লাহকে শাস্তি না দিয়ে ছেড়ে দিয়েছিলেন। কোরান সংকলন-সম্পাদনা করে রাজ্যের সর্বত্র মানুষের হাতে লেখা 'কোরান' আগুনে পুড়িয়ে ফেলেছেন। সেগুলোতে কি লেখা ছিল পৃথিবীর মানুষ কোনোদিন জানতে পারবে না। গরিব কৃষকদের জমি জবরদস্তি দখল করে মদিনার মসজিদ সম্প্রসারণ করে মানুষকে ভিটেহীন করেছেন। ঘোড়ার ওপর ট্যাক্স আরোপ করে নবীর আদর্শকে কলংকিত করেছেন। 'প্রজাস্বত্ব হস্তান্তর' আইন প্রণয়ন করে নিজের আত্মীয় উমাইয়া বংশের মানুষকে জমিদার বানিয়ে সাধারণ মানুষকে ভিখারী করেছেন। মাদকাসক্ত, ব্যাভিচারী, মিথ্যাচারী, দেশের স্বঘোষিত নামকরা সন্ত্রাসী, যাদের মধ্যে চরিত্রের বালাই নেই তাদেরকে গভর্নর পদে নিযুক্ত করেছেন। বায়তুলমাল থেকে টাকা আত্মসাৎকারী কুফার গভর্নর কুখ্যাত অলিদের কথায় তার কোষাধক্য সাহাবি ইবনে মাসউদকে সকলের সম্মুখে জঘন্য ভাষায় গালাগালি করেছন। এই তো সেদিন ইবনে মাসউদকে মসজিদে দেখে উসমান বলেছিলেন, 'ঐ দেখো বাঁদির বাচ্চা নষ্টের কীট এসেছে, সে যে পাতে খায় সেই পাতে মলত্যাগ করে।' ইতিপূর্বে ইবনে মাসউদ (রাঃ) কুফার গভর্নর হজরত অলিদের অন্যায় অবিচার সহ্য করতে না পেরে পদত্যাগ করে মদিনায় চলে এসেছিলেন। হজরত আয়েশা, মসজিদ সংলগ্ন ঘর থেকে উসমানের গালিগালাজ শুনে বেরিয়ে এসে বলেছিলেন, আপনি নবীর বিশ্বস্ত সাহাবিদেরকে এমনভাবে গালাগালি করছেন? আয়েশার কথায় খলিফা ভীষণ রাগান্বিত হয়ে ইবনে মাসউদকে (রাঃ) এমন লাথি মেরেছিলেন যে, সাহাবি মাসউদের কোমরের একটি হাড় ভেঙ্গে গিয়েছিল। অজ্ঞান অবস্থায় মাসউদকে সেদিন উসমান টেনে হিঁচড়ে

'মসজিদে নববী' থেকে বের করে দিয়েছিলেন। কিছুদিন আগে সাহাবি হজরত আম্মার ইবনে ইয়াসের (রাঃ) খলিফা উসমানের অর্থনৈতিক স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিবাদ করেছিলেন। কারণ খলিফার বিরুদ্ধে বায়তুলমাল থেকে যুদ্ধলব্ধ গনিমতের মাল, কিছু স্বর্ণালংকার ও মণি-মুক্তা চুরির অভিযোগ এনেছিলেন মদিনার কিছু লোক। খলিফার বেশ কয়েকজন আত্মীয়ের গায়ে সেই অলংকারের প্রমাণও তারা দেখিয়েছিলেন। উসমান (রাঃ) মুয়াবিয়ার ভাষায় বলেছিলেন, 'বায়তুলমালের সম্পদের মালিক আল্লাহ। আমি আল্লাহর মনোনীত খলিফা। আল্লাহর মনোনয়ন ছাড়া খলিফা হওয়া যায় না। সম্পদ ব্যবহার হবে আমার ইচ্ছায়, তোমাদের তাতে কিছু বলার কোনো অধিকার নেই।' আম্মার ইবনে ইয়াসের ও হজরত আলি একসাথে সমস্বরে বলেছিলেন, 'খলিফা, আল্লাহর কসম, আমি হবো আপনার প্রথম প্রতিবাদী। বায়তুলমালের সম্পদের জবাবদিহি আপনাকে করতেই হবে।' খলিফা উসমান, আম্মার ইবনে ইয়াসেরকে বন্দী করে এমন শাস্তি দিয়েছিলেন যে, তিনদিন তাঁকে বেহুশ হয়ে মৃত অবস্থায় উম্মে সালমার (রাঃ) গৃহে পড়ে থাকতে হয়। আয়েশাও সে ঘরে উপস্থিত ছিলেন। হজরত উসমান সেদিন হযরত আলিকেও বলেছিলেন: 'বেশি বাড়াবাড়ি করলে তোমারও আম্মারের অবস্থা হবে।' আলিও রক্তবর্ণ চোখ দেখিয়ে বলেছিলেন, 'আত্মম্ভরী উসমান, আল্লাহর কসম, আমার পিতা তোমার পিতার চেয়ে উত্তম, আমার মা তোমার মায়ের চেয়ে উত্তম, নবীর কাছে আমার মর্যাদা তোমার চেয়ে অনেক বেশি। আমাকে দেশ ত্যাগের নির্দেশ দিয়ে একবার চেষ্টা করে দেখতে পারো কোথাকার জল কোথায় গড়ায়!' এসব কিছু স্মরণ করে আলি বললেন, 'আজ আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারবো না। এর আগে বহুবার আপনাকে সতর্ক করেছি, পরামর্শ দিয়েছি, আপনি তো কানেই তোলেননি। বরং কিছুদিন আগে একজন বিশিষ্ট সাহাবি হজরত আবু জওহর গিফ্ফারিকে (রাঃ) বিনা অপরাধে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিলেন। আমি এর প্রতিবাদ করায় আপনি আপনার মন্ত্রী মারওয়ানের পক্ষ নিয়ে আমাকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে প্রায় গলা ধাক্কা দিয়ে প্রসাদ থেকে বের করে দিয়েছিলেন।' উসমানেরও মনে আছে সেদিন হজরত আলিও কম বলেননি। উসমান জানেন কোথায় আলির পিতা আবু তালিবের হাশিমি বংশ আর কোথায় উসমানের উমাইয়া বংশ। কিন্তু আজ তিনি নীরবে শুধু আলির কথা শুনতে থাকলেন। উসমান বললেন, 'আলি, আমি জনগণের সকল অভিযোগ স্বীকার করে তাদের দাবি মেনে নেবো, তুমি তাদেরকে মদিনা থেকে ফিরিয়ে দাও।' হজরত আলি, তার কাছে ইতিপূর্বে বিদ্রোহীদের দেয়া অভিযোগ ও দাবিসমূহ উসামানকে এক-এক করে শুনালেন। অভিযোগগুলো শুনে হজরত উসমান, সকল দোষ তাঁর পূর্ববর্তী দুই খলিফার ওপর, বিশেষ করে হজরত ওমরের ওপর চাপিয়ে দিলেন। তিনি আঙুলে গুণে কয়েকজন দুধর্ষ দুষ্কৃতিকারী সাহাবির নাম উল্লেখ করে বললেন, 'দেখো আলি, এদেরকে দ্বিতীয় খলিফা ওমর গভর্নর পদে নিয়োগ করে গেছেন। সিরিয়ার গভর্নর মুয়াবিয়া কেমন মানুষ তুমি তো জানো। তার মতো মানুষকে সরিয়ে আমার খেলাফত কি একদিনও টিকবে?' অতি নম্র ভাষায় উসমান আরো বললেন, ' দেখো, বিগত দুই খলিফাও অনেক ভুল করেছিলেন কিন্তু কেউ তো কোনোদিন তাদের পদত্যাগ দাবি করেনি, আমার বেলায় কেন এমন হচ্ছে? আমি শুধু একটি দাবি বাদে জনগণের বাকি সব দাবি মেনে নেবো। আমি ক্ষমতা ত্যাগ করতে পারবো না।' হযরত আলি বললেন : 'ঠিক আছে, আপনি যে জনগণের দাবি মানতে রাজি তার একটি প্রমাণ দিন। কিছুদিন পূর্বে নবীপত্নী আয়েশাও উসমানকে বলেছিলেন, 'খেলাফত ত্যাগ করে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করুন এবং আমার ভাই মুহাম্মদকে মিশরের গভর্নর পদে নিযুক্ত করুন।' নবীপত্নী আয়েশা তার ভাই মুহাম্মদকে সরকারি কোনো পদ না দেওয়ায় উসমানকে সেই প্রথম থেকেই ঘৃণার চোখে দেখতেন। আয়েশা এবং তাঁর ছোট বোনের স্বামী হজরত তালহা (রাঃ) ও বড় বোনের স্বামী হজরত জুবায়ের (রাঃ) যে বিদ্রোহীদের সমর্থনকারী, খলিফা উসমান তা টের পেয়েছিলেন। সবকিছু বিবেচনা করে উসমান ঘোষণা দিলেন যে, আজ থেকে মিশরের নতুন গভর্নর মুহাম্মদ ইবনে আবু বকরকে (আয়েশার ভাই) নিযুক্ত করা হলো। সরকার জনগণের সকল অভিযোগ স্বীকার করে নিয়েছেন এবং সকল দাবি-দাওয়া মেনে নিয়ে ক্ষতিপূরণ দিতে রাজি হয়েছেন। ঘোষণা পত্রে উসমান দস্তখত করলেন। বিবি আয়েশার ভাই মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর কিছু গণ্যমান্য নেতৃস্থানীয় লোককে সঙ্গে নিয়ে মিশরের পথে রওয়ানা হয়ে যান। মদিনায় জড়ো হওয়া বিক্ষুব্ধ জনতা খলিফার ঘোষণা বাস্তবায়নের আশা বুকে ধারণ করে নিজ নিজ এলাকায় ফিরে যেতে থাকলেন। মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর, মিশর পৌঁছার আগেই খলিফা উসমানের প্রতারণামূলক প্রতিশ্রুতি জনসমক্ষে ধরা পড়ে যায়। উসমান তাঁর নিজস্ব গুপ্তচরকে একটি চিঠি দিয়ে মিশর প্রেরণ করেছিলেন। চিঠিতে লেখা ছিল : "মুহাম্মদকে তার দল নিয়ে মিশর পৌঁছামাত্র যেন হত্যা করা হয় এবং পরবর্তী নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত বিদ্রোহীদেরকে বন্দী করে রাখা হয়।" গুপ্তচর মুহাম্মদ ইবনে আবু বকরের দলের হাতে ধরা পড়ে যায়। সকলে মদিনায় ফিরে আসলেন। বিচার ডাকা হলো। বিচারের ভার দেয়া হলো হজরত আলির হাতে। হজরত আলি, খলিফা উসমানকে জিজ্ঞেস করলেন :

-এই গুপ্তচর কি আপনার?
-জ্বি, আমার।
-এই উট কি আপনার?
-জ্বি, আমার।
-এই চিঠির সীলমোহর কি আপনার?

-হ্যাঁ, আমার ।
-এই চিঠির নিচে স্বাক্ষর কি আপনার?
-হ্যাঁ, তাই তো মনে হয় ।
-এই চিঠি আপনি লিখেছেন?
-আল্লাহর কসম, আমি লিখি নাই ।
-আপনি কাউকে লিখতে বলেছিলেন?
-আল্লাহর কসম, আমি কাউকে লিখতে বলি নাই ।

হজরত আলি লেখা পরীক্ষা বিশেষজ্ঞগণকে চিঠির লেখা পরীক্ষা করতে অনুরোধ করলেন । বিশেষজ্ঞগণ একমত হলেন, চিঠির লেখা মারওয়ানের হাতের । আলি মারওয়ানকে বিচারে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দিলেন । উসমান বাধা দিলেন, মারওয়ানকে এখানে আনা যাবে না । গর্জে উঠলো উপস্থিত জনতা । মদিনার আকাশ-পাতাল কাঁপিয়ে বজ্রধ্বনি উঠলো, আল্লাহু আকবার! আল্লাহু আকবার!, ইনতেকাম! ইনতেকাম! (প্রতিশোধ! প্রতিশোধ!) । মুহূর্তে সে আগুন ছড়িয়ে পড়লো মদিনার অলিতে গলিতে । অবস্থা আয়ত্বের বাইরে দেখে হজরত আলি, হজরত তালহা ও হজরত জুবায়েরসহ অনেকেই স্থান ত্যাগ করে চলে গেলেন । জনতা খলিফার গৃহ অবরোধ করলো । চার হাজারেরও বেশি মানুষের গৃহ অবরোধের শেষ পরিণতি আন্দাজ করতে পেরে নবীপত্নী আয়েশা চলে গেলেন মক্কায় আর আলি শহর ছেড়ে অন্যত্র চলে যান । স্বপরিবারে পূর্ণ বিশদিন অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকার পরও উসমান ক্ষমতা ছেড়ে দিতে রাজি হলেন না । তাঁর একটি আশা ছিল সিরিয়া ও বসোরা থেকে সৈন্যবাহিনী এসে তাঁকে উদ্ধার করবে । হিজরি ৩৫ সালের ১৭ ই জিলহাজ্ব, শুক্রবার । হজরত মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর (রাঃ) প্রাসাদের ছাদের ওপর দিয়ে জানালা ভেঙে খলিফা উসমানের কক্ষে ঢুকে পড়েন । হাতে উন্মুক্ত শাণিত তরবারি, সঙ্গে আরো ৪ জন । উসমান আসন্ন মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জীবনের শেষ মিনতি, বেঁচে থাকার শেষ প্রতারণা করলেন । বুকের ওপর দুই হাতে কোরান ধরে বসে রইলেন । নবীজির দোহাই দিলেন, মুহাম্মদকে তাঁর পিতা আবু বকরের দোহাই দিলেন, কোরানের দোহাই দিলেন । মুহাম্মদ ভীষণ শক্ত হাতে উসমানের সাদা ধবধবে দাঁড়িতে ঝাপটে ধরে টান দেন, উসমান মাটিতে পড়ে যান । উপর্যুপরি খঞ্জরের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায় উসমানের সর্বাঙ্গ[১৮] । ঘরের মেঝের ওপর দিয়ে বয়ে গেল ইসলামের তৃতীয় খলিফা হজরত উসমানের দেহনিঃসৃত রক্তের স্রোতধারা । তলোয়ারের আঘাতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল কোরানের পাতাগুলো । উসমানের রক্তে সিক্ত, লাল রঙে রঞ্জিত, কোরানের ছিন্ন পাতাগুলোর সাথে তাঁর প্রাণহীন দেহটিও মেঝেতে পড়ে রইলো তিন দিন, তিন রাত্রি । চতুর্থ দিন রাতের অন্ধকারে, গোপনে হজরত আলি কতিপয় যুবককে নিয়ে লাশটি সংগ্রহ করে, জনবিরল এক গলিপথে শহরের বহির্ভাগে নিয়ে জান্নাতুল-বাকির পার্শ্ববর্তী ফাঁকা জমিতে সমাহিত করেন ।

(৬)

ইসলামের চার খলিফার কেউই তাঁদের জীবদ্দশায় জনগণের শত দাবির মুখেও ক্ষমতা ত্যাগ করেননি । তাদের তিনজনকেই জনতার রোষানলে পড়ে প্রাণ হারাতে হয়েছিল । পূর্বে উল্লেখ করেছিলাম, হজরত উসমানের খেলাফতের মধ্য দিয়ে ইসলামের ঘরে যে অনলের স্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠে, তা হজরত আলির যুগে এসে দাবানলে পরিণত হয় । হজরত আয়েশার আশা ছিল, উসমান-পরবর্তী মদিনার খলিফা হবেন তাঁর দুই দুলাভাই হজরত তালহা (রাঃ) অথবা হজরত জুবায়ের (রাঃ) । জনগণ হজরত আলিকে বিপুল ভোটে মদিনার চতুর্থ খলিফা নির্বাচিত করে । নবীপত্নী আয়েশা এমনিতেই হজরত আলিকে মনে-প্রাণে ঘৃণা করতেন । হজরত আলি ছিলেন বিবি আয়েশার চক্ষুশূল । আয়েশা ছিলেন ব্যক্তি স্বার্থপর নারী । যে মহিলার বিছানার ভেতর থাকা অবস্থায় জিব্রাইল ওহি নিয়ে আসতেন বলে নবী মুহাম্মদ (দঃ) গর্ব করতেন, সেই আয়েশা যখন ঘোষণা দিলেন উসমান হত্যায় হজরত আলি জড়িত, মানুষ তা

[১৮] Muhammad b. Abi Bakr, accompanied by Kinanah b. Bishr b. 'Attab, Sudan b. Humran and 'Amr b. al-Hamiq, reached 'Uthman by climbing over the wall from the house of 'Amr b. Hazm. They found 'Uthman, with his wife Na'ilah, reading the Surah of the Cow from the Qur'an. Muhammad b. Abi Bakr came up to them and seized 'Uthman's beard. "May God disgrace you, you hyena," he said. 'Uthman replied, "I am no hyena. I am God's servant and the Commander of the Faithful."Muhammad said, "Neither Mua'wiyah nor anyone else has been of any use to you." 'Uthman said, "Son of my brother, let go my beard. Your father would not have gripped like this." Muhammad replied, "Had my father seen you doing these things, he would have denounced you for them, and I mean to do worse to you than grab your beard." 'Uthman said, "I seek God's help and support against you." Then Muhammad pierced his forehead with a broad iron-tipped arrow that he was holding. Kinanah b. Bishr raised some arrows of the same kind that he was holding, and plunged them into the base of 'Uthman's ear down to his throat. Then he fell on him with his sword until he killed him (al-Tabari, Abu Ja'far Muhammad b. Jarir, *The Crisis of the Early Caliphate,* vol. xv. Translated and annotated by R. Stephen Humphreys, State University of New York Press, Albany, 1990. ISBN 0-7914-0155-3, pp.219-220).

অবিশ্বাস করতে পারলো না। সাহাবি হজরত তালহা ও হজরত জুবায়ের (আয়েশার দুই দুলাভাই) আলিকে খলিফা মেনে নিয়ে শপথ গ্রহণ করেছিলেন। আয়েশার পরামর্শে তারা সে শপথ অস্বীকার করে বললেন যে তাদেরকে অস্ত্রের মুখে বাধ্য করা হয়েছিল আলিকে খলিফা মানতে। উসমান হত্যার প্রতিশোধ নিতে হজরত আয়েশার ডাকে উমাইয়া বংশ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো। তাঁর সাথে যোগদান করলো বেশকিছু মুসলিম, যারা নবী মুহাম্মদের (দঃ) অস্ত্রের মুখে প্রাণ রক্ষার্থে মুসলমান হয়েছিল আর যাদের মাতা-পিতা আত্মীয়স্বজন নবী মুহাম্মদের নির্দেশে হজরত আলির হাতে খুন হয়েছিল।

এদিকে খেলাফত লাভের সাথে সাথে হজরত আলি সকল প্রাদেশিক গভর্নর পদ বাতিল করে দেন। কিছু উমাইয়া বংশীয় গভর্নরগণ পদত্যাগ করলো বটে কিন্তু রাজস্বভাণ্ডার লুটপাট করে শূন্য করে দিল। আর অনেকেই আলির খেলাফত অস্বীকার করলো। হজরত আলির জন্য প্রাদেশিক গভর্নর সমস্যার চেয়ে আয়েশার সৃষ্ট সমস্যা মারাত্মক হয়ে দেখা দিল। প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারেননি, তাঁর সর্বকণিষ্ঠ সৎ-শাশুড়ি বিবি আয়েশা তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবেন। হজরত উসমানকে যখন হত্যা করা হয়, আয়েশা তখন মক্কায় ছিলেন। সেখান থেকেই যুদ্ধের প্রস্তুতি নিলেন। হজরত আয়েশা, আলি (রাঃ) কর্তৃক ক্ষমতাচ্যুত, ইয়েমনের গভর্নরের দেয়া পুরস্কার, অত্যাধিক সুন্দর, হৃষ্ট-পুষ্ট তাজা উট আল-আসকারের ওপর আরোহণ করলেন। পেছনে তাঁর ১০০০ হাজার সশস্ত্র সৈন্য। ডান পাশে হজরত তালহা (রাঃ), বামপাশে হজরত জুবায়ের (রাঃ)। আয়েশার জীবনে বাল্যকালের আনন্দ ছিল না। যৌবন ছিল চরম হতাশা আর বেদনায় ভরা। যুদ্ধের ময়দানে হারিয়ে যাওয়ায় আয়েশার ওপর লোকে সেনাপতির সাথে কেলেঙ্কারি রটিয়েছে। মানুষ তাঁকে সতীত্বের অপবাদ দিয়েছে। আজ আয়েশার দু'চোখ থেকে ঠিকরে বেরুচ্ছে সারা জনমের জ্বলন্ত হিংসার স্ফুলিঙ্গ! মা বেরিয়েছেন, তার চেয়ে বয়সে বড় তার মেয়েকে (নবীকন্যা ফাতিমা) বিধবার কাফন পরাতে। হায়, নবীজি মুহাম্মদ! একবার এসে দেখে যান, আপনার বিষবৃক্ষে কি অপরূপ ফল ধরেছে। দেখে যান, আদরের দুলালী ফাতিমা জননীর স্বামীকে বধ করতে আপনার প্রিয়তমা বালিকা বধুর হাতে খঞ্জর। এ তো আপনারই শিক্ষা। এ তো আপনারই দেখানো সেই পথ! সর্বনাশা এই পথের সন্ধান 'উলমে সালমা' জানতেন কিভাবে? উম্মুল-মোমেনিন (মুসলিম জাতির মা) হজরত আয়েশা সৈন্যদল নিয়ে বসোরার পথে রওয়ানা হবার আগে, তাঁর অন্যতম সতীন উম্মে সালমাকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন। সালমা বললেন, ' অসম্ভব! আয়েশা তুমি ঐ সর্বনাশা পথে পা বাড়িও না। নবীজি আমাকে কানে কানে বলে গেছেন, একদিন একদল সশস্ত্র লোক ঐ পথে যাত্রা করবে যাদের নেতৃত্বে থাকবে একজন মুসলিম নারী। সে নারী, আমার উত্তরাধিকারী, খাতুনে জান্নাত মা ফাতিমার স্বামী, আমার প্রিয় জামাতা হজরত আলির নেতৃত্ব অস্বীকার করবে। নবীজি আরও বলেছেন, যারা আমার আলির নেতৃত্ব অস্বীকার করবে, মনে করো তারা আমাকেই অস্বীকার করলো। আয়েশা তুমি সেই অভিশপ্ত নারী হতে যেও না।'

আয়েশার শরীরের রক্তধারা আজ উজান বইছে। উম্মে সালমার নির্বোধ কথা শুনার সময় আয়েশার নেই। বসোরার পথে আয়েশার দলে আরও ২ হাজার লোক যোগদান করলো। বসোরার গভর্নর আয়েশাকে বাধা দিলেন। ৩ হাজার সৈন্য নিয়ে আয়েশা রাজধানীতে ঢুকে পড়লেন। তারা আলির নতুন খলিফা, গভর্নর উসমান বিন হোনায়েফকে (রাঃ) নামাজরত অবস্থায় বন্দী করে তাঁর দাঁড়ি-গোঁফ মুণ্ডায়ে শহর থেকে বের করে দিলেন। হজরত আলি যখন উম্মে সালমা মারফত আয়েশার মনোভাবের সংবাদ পেলেন, ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে ৪০ জন নিরপরাধ মানুষ হত্যা করে আয়েশার সেনাবাহিনী বসোরা দখল করে নিয়েছেন। আলি (রাঃ) তাৎক্ষণিকভাবে মাত্র ৯শত সৈন্য নিয়ে বসোরার পথে রওয়ানা হয়ে যান। নবীজির প্রাণপ্রিয় দৌহিত্র (হযরত আলির সন্তান) হাসান ও হোসেন আর বসে থাকতে পারলেন না। পিতার নির্দেশে হজরত হাসান (রাঃ) অতিসত্তর কুফায় চলে যান। সেখান থেকে ৯ হাজার সৈন্য সংগ্রহ করে পিতার সাথে মিলিত হন। আলির পরাজিত গভর্নর উসমান বিন হোনায়েফ (রাঃ) এসে বসোরার অবস্থা বর্ণনা করলেন। আলি (রাঃ) মুচকি হেসে বললেন, 'বৃদ্ধ গভর্নর পাঠিয়ে ছিলাম, এ দেখছি যুবক হয়ে ফিরে আসলেন'। ধীরে ধীরে হজরত আলির সৈন্য সংখ্যা দাঁড়ালো ২০ হাজারে আর আয়েশার ৩০ হাজার। প্রথমাবস্থায় হজরত আলি ও হজরত তালহার মধ্যে সাময়িক বাকযুদ্ধ হলো। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসলো, পরের দিন আরো আলাপ হবে বলে তারা নিজ নিজ তাঁবুতে ফিরে গেলেন। ছোটবেলা থেকেই আয়েশা তার স্বামী মুহাম্মদের (দঃ) রণকৌশল দেখে আসছেন। পরের দিন আরো আলাপ করার জন্যে আয়েশা এতদূর আসেন নাই। রাতের অন্ধকারে অতর্কিতভাবে আয়েশার সৈন্যদল হজরত আলির সেনা-তাঁবুতে আক্রমণ করে বসলো। অতি অল্পসময়েই তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। রাত হতে সকাল পেরিয়ে দুপুর গড়িয়ে গেল, যুদ্ধ আর থামে না। হজরত আলির দক্ষ সেনাবাহিনীর সামনে আয়েশার সৈন্যগণ আর কতক্ষণ টিকে থাকবে? আয়েশার সৈন্যদল দুর্বল হয়ে পড়লো। তারা পশ্চাদগমনের প্রস্তুতি নিল। এতক্ষণে দশহাজার মুসলিম সন্তানের তাজা রক্তে শুষ্ক-মরুভূমি রক্তনদীতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। নবীজির কাছ থেকে 'সাইফুল্লাহ' (আল্লাহর তরবারি) খেতাব প্রাপ্ত বীরের সামনে, উটের ওপর রমণীর উঁচু শীর! হজরত আলির আর সহ্য হয় না। নির্দেশ দিলেন, আয়েশার উটের পা কেটে ফেলা হউক। উটসহ আয়েশা মাটিতে পড়ে যান। হজরত আলি, আয়েশার ভাই মুহাম্মদ ইবনে আবু বকরকে বললেন, তোমার বোনকে উঠিয়ে মদিনায় নিয়ে এসো। (ইসলামের ইতিহাসে এ যুদ্ধ 'জঙ্গে জামাল' নামে অধিক

পরিচিত)। হজরত আলি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন বটে, কিন্তু কল্পনা করতে পারলেন না, সামনে তাঁর জন্যে ও তাঁর আদরের ধন হজরত হাসান ও হোসেনের জন্যে অপেক্ষা করছে ভয়াবহ সিফফিন ও কারবালা।

জামাল যুদ্ধে পরাজিত আয়েশাকে (রাঃ) বন্দী করে মদিনায় পাঠিযে দিয়ে হজরত আলি (রাঃ) বসোরা থেকে কুফায় গমন করলেন ৩৬ হিজরির রজব মাসে। সিদ্ধান্ত নিলেন মুসলিম সাম্রাজ্যের রাজধানী মদিনা থেকে কুফায় স্থানান্তরিত করবেন। হজরত মুয়াবিয়া (রাঃ) তখনও সিরিয়ার গভর্নর। মুয়াবিয়া (রাঃ) যে, হজরত আলিকে খলিফা হিসেবে এত সহজে মেনে নেবেন না, তা আলিরও জানা ছিল। আর মুয়াবিয়াও হজরত আলিকে লোমে-পশমে চেনেন। রহস্যজনক ভাবে মুয়াবিয়া, হজরত আয়েশার সমর্থনে জামাল যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে, নিরপেক্ষতা অবলম্বন করেন। আলির জন্যে তা ছিল বিরাট উপকারী। কিন্তু আলি জানতেন না যে, আসলে হজরত মুয়াবিয়া সিরিয়ায় হজরত আলিকে লৌহকঠিন খাঁচায় বন্দী করার ফাঁদ পেতে রেখেছেন। মুয়াবিয়া রাজ্যের সর্বত্র প্রচার করে দিলেন যে, আলি ইচ্ছে করলে উসমানকে বাঁচাতে পারতেন, কিন্তু ক্ষমতালোভী আলি তা না করে হত্যাকারীদেরকে সহযোগিতা করেছেন এবং বাহুবলে শক্তি প্রয়োগ করে অন্যায়ভাবে ক্ষমতা দখল করেছেন। জামাল যুদ্ধে আলি যখন আয়েশার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ময়দানে, মুয়াবিয়া তখন অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত। হজরত মুয়াবিয়া সারা পৃথিবীতে উমাইয়াবংশীয় শাসন কায়েম করতে চান। তার আগে হাশেমি বংশের নবী মুহাম্মদের (দঃ) একমাত্র উত্তরাধিকারী হজরত আলির জীবন প্রদীপ চিরতরে নিভিয়ে দেয়া চাই।

হজরত উসমানের সুদীর্ঘ বারো বছরের অপশাসনে আরব মুসলিম সাম্রাজ্যে যে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছিল, উসমান হত্যার মধ্য দিয়ে তা আরও দ্বিগুণ হয়ে দেখা দিল। হযরত আলির রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণের মাধ্যমে মুসলিমবিশ্ব এই সর্বপ্রথম কোরায়েশ বংশের হাশেমি গোত্রের নবী মুহাম্মদের রক্ত-সম্পর্কের একজন খলিফা পেলো। আলি একজন সাহসী যোদ্ধা ছিলেন বটে কিন্তু দক্ষ রাজনীতিবিদ মোটেই ছিলেন না। ক্ষমতায় বসেই মারাত্মক ভুল করে বসলেন। আলির চোখে ভেসে ওঠে মুসলিম সাম্রাজ্যের এক কুৎসিত ভয়ঙ্কর প্রতিচ্ছবি। তাঁর মনে পড়ে সেই কালো রাত্রির কথা, যে রাতে হজরত ওমর তাঁর দরজার সামনে এসে হাঁক দিয়ে বলেছিলেন : "কে আছো ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসো, আর আবু বকরের খেলাফত গ্রহণ করো, অন্যথায় মানুষসহ ঘরে আগুন ধরিয়ে দেবো।' হজরত ফাতিমা বের হয়ে বলেছিলেন, 'আমার ঘরে নবীজির বিশ্বস্ত কয়েকজন সাহাবি মেহমান আছেন। ওমর, তুমি কি নবীজির মেয়ের ঘর আগুনে পোড়াতে চাও, যার হাতে আছে বেহেস্তের চাবি?" উল্লেখ্য, আবু বকরের খেলাফত গ্রহণ করার পর থেকে, ফাতিমার ঘরে রাতে কিছু লোক নিয়মিত বৈঠক করে পরামর্শ করতেন। তারা ফাতিমা ও আলির মতো আবু বকরের খেলাফত অস্বীকার করেছিলেন। ঐ ঘটনার পর হজরত ফাতিমা তাঁর স্বামীকে অনুরোধ করেছিলেন, মৃত্যুর পর যেন তাঁকে রাতের আঁধারে গোপনে দাফন করা হয়, যাতে হজরত ওমর তাঁর জানাজায় আসতে না পারেন। এর কিছুদিন পরেই হজরত ফাতিমা ইন্তেকাল করেন। রাজ্যের সর্বত্রই হজরত আলি দেখতে পান মদ্যপায়ী, উচ্চাভিলাসী, শরিয়া-বিরোধী, স্বৈরাচারী স্বেচ্ছাচারী, নারী-আসক্ত, ভোগ-বিলাসী শাসকদের চেহারা। হজরত আলি এক সাথে সকল প্রাদেশিক গভর্নরের পদ 'অবৈধ' ঘোষণা করে দেন। রাগের বশে, আবেগের বশে, অথবা তাঁর ও তাঁর স্ত্রী হজরত ফাতিমার ওপর আবু বকর, ওমর ও ওসমান কর্তৃক সারা জীবনের অপমান, অত্যাচারের প্রতিশোধ হিসেবেই হোক, হজরত আলির এ কাজটি ছিল অদূরদর্শিতার প্রমাণ। বেশ কিছু প্রাদেশিক গভর্নর তৃতীয় খলিফা উসমান হত্যার বিচার না হওয়া পর্যন্ত পদত্যাগ করা তো দূরের কথা, আলির খেলাফতই মেনে নিতে রাজি হলো না। 'উসমান হত্যার বিচার' ইস্যুটি ছিল হজরত মুয়াবিয়ার চক্রান্ত, আলির জন্যে এক মরণফাঁদ। মুয়াবিয়ার কাছে 'সবার ওপরে ধন আর ক্ষমতা সত্য'-এর উর্ধ্বে কিছুই ছিল না। হজরত মুয়াবিয়া ছিলেন নবী মুহাম্মদের (দঃ) রাজনৈতিক সচিব। মুয়াবিয়াই সম্ভবত নবী মুহাম্মদের (দঃ) 'ইসলাম' সৃষ্টির গোপন রহস্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন এবং রপ্তও করতে পেরেছিলেন। তাই রাজনৈতিক ইসলামের সর্বোচ্চ শ্রেষ্ঠ ফসল সম্ভবত তিনিই সবচেয়ে বেশি উপভোগ করেছিলেন। মুয়াবিয়া কোনোদিনই ইসলাম ধর্ম গ্রহণে আগ্রহী ছিলেন না, কিন্তু তাঁর (মুহাম্মদের) মাস্টার মাইন্ডেড ছল-চাতুরী, কৌশল, রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, অভিলাষ ভালোভাবেই অনুকরণ করেছিলেন। আর আজ সেই দক্ষতা দিয়ে প্রফেট বংশের শেষ বাতিটি চিরদিনের জন্যে নিভিয়ে দিতে মুয়াবিয়া উদ্দ্যত হয়েছেন। সারা মুসলিমজগৎ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। উসমান হত্যায় জড়িত মিশর, মক্কা, কুফাসহ বিভিন্ন প্রদেশের বিদ্রোহীগণ হজরত আলিকে পরিস্কার হুমকি দিয়ে বসলো, যদি উসমান হত্যার বিচার করা হয়, তাহলে আলিকেও উসমানের মতো বড়ই দুঃখজনক ও মর্মান্তিক পথে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হবে। আলি দেখলেন তিনি আজ সাত-পাঁকে বাঁধা পড়ে গেছেন। তলোয়ার দিয়ে রক্তের হুলি খেলা যে আলির নেশা, যে আলি মুহাম্মদের (দঃ) সহচরী হয়ে ৯৮টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে তাঁর কাছ থেকে 'আলি হায়দার', 'সাইফুল্লাহ' 'বীরশ্রেষ্ঠ' খেতাবসমূহ পেয়েছিলেন সে আলী আজ কিংকর্তব্যবিমূঢ়, বড়ই ক্লান্ত। আজ মানুষের রক্তাসক্ত, আলির মাতাল তরবারি চায় একটু বিরতি, শান্তির একটু নিঃশ্বাস। কিন্তু তা তো হবার নয়। ক্ষমতা আর রক্ত যে একে অপরের সম্পূরক সে কথা বুঝতে আলির মোটেই দেরি হলো না।

(৭)

এখানে হজরত মুয়াবিয়ার জীবনের বিবিধ কার্যাবলী ও মুহাম্মদ (দঃ) বংশের হজরত আলির সাথে তাঁর শত্রুতার কারণ বুঝার প্রয়োজনে মুয়াবিয়ার সংক্ষিপ্ত পরিচয় জেনে নেয়া ভাল। হজরত মুয়াবিয়া ছিলেন সাহাবি হজরত আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দার জারজ সন্তান। আবু সুফিয়ানের সাথে হিন্দার বিবাহের তিন মাস পরে মুয়াবিয়া জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মাতা হিন্দা ছিলেন একজন 'বেশ্যা'। উর্দুভাষী একাধিক ঐতিহাসিক, হিন্দার চারিত্রীক বর্ণনায় 'বেশ্যা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। অন্যান্য সূত্রানুযায়ী হিন্দা, বেশ্যা না হলেও তিনি যে বহু-পুরুষগামী (Tart) মহিলা ছিলেন এবং মুয়াবিয়া যে তার জারজ সন্তান তার কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় হজরত হাসান (রাঃ) ও হজরত আয়েশার (রাঃ) উক্তিতে। শাম ইবনে মুহাম্মদ কালভি (রঃ) তাঁর 'কেতাবে মোসাব' বইয়ে লেখেন, 'হজরত হাসান (রাঃ) (হজরত আলির ছেলে, নবী মুহাম্মদের দৌহিত্র) একদিন ব্যঙ্গ করে হজরত মুয়াবিয়াকে বলেন, তোমার কি মনে আছে তোমার আসল পিতা কে? ইবনে আবি আল হাদিদ তাঁর '*নাহজুল বালাগা*' (ভলিউম ১০, পৃষ্ঠা ১৩০) বইয়ে উল্লেখ করেন, মুয়াবিয়ার জন্মদাতা হিসেবে সম্ভাব্য চারজন পিতার নাম লোকমুখে শুনা যায়; তারা হলেন : আবি ইবনে ওমর বিন মুসাফির, ওমর বিন ওলিদ, আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব এবং সাবাহ (এক ইথোপিয়ান কৃষ্ণাঙ্গ)। একই বক্তব্য পাওয়া যায় '*রাবিউল আবরার*' (ভলিউম ৩, পৃষ্ঠা ৫৫১) কেতাবে আল্লামা হজরত জামাক্শারির লেখায়। তবে যেহেতু আবু সুফিয়ানের, উতবা নামে সর্বজন স্বীকৃত আরেকজন জারজ সন্তান ছিলেন, আমরা ধরে নিতে পারি, বিয়ের আগে হজরত আবু সুফিয়ানের সাথে হিন্দার দৈহিক সম্পর্কের ফসল হজরত মুয়াবিয়া। মুয়াবিয়া কর্তৃক আবু বকরের পুত্র মুহাম্মদকে গাধার চামড়ায় মুড়িয়ে বস্তাবন্দী করে তাতে আগুন ধরিয়ে হত্যার সংবাদ শুনতে পেয়ে আবু সুফিয়ানের মেয়ে, মুয়াবিয়ার বোন ও নবীজির স্ত্রী উম্মে হাবিবা (আরেক নাম রামালা) আয়েশাকে আস্ত একটি ছাগল রান্না করে 'সদকা' হিসেবে পাঠিয়ে দেন। আয়েশা জিজ্ঞেস করেন, 'এর অর্থটা কি?' উত্তরে উম্মে হাবিবা বললেন, 'উসমান হত্যার পুরুস্কার। তোমার ভাই উসমানকে খুন করেছিল।' আয়েশা অভিশাপ দিয়ে বলেন, 'বহু-পুরুষগামী হিন্দার মেয়ের ওপর আল্লাহর গজব বর্ষিত হোক।' এর পরে আয়েশা যতোদিন জীবিত ছিলেন, উম্মে হাবিবা ও তাঁর মা হিন্দাকে নামাজ শেষে অভিশাপ দিয়েছেন। (আর যতদিন বেঁচে ছিলেন নিজে কখনো ভাজা মাংস স্পর্শ করেননি)। এই হিন্দা (আবু সুফিয়ান পত্নী) 'পিতৃহত্যা-ভাতৃহত্যা ও চাচা হত্যার প্রতিশোধ' হিসেবে নবীজির চাচা হজরত হামজার কলিজা ভক্ষণকারী বলেও পরিচিত![১৯]

মুহাম্মদের (দঃ) মক্কা বিজয়ের পরে আবু সুফিয়ান নিজ পরিবার ও গোত্রের মানুষের প্রাণ রক্ষার্থে বাধ্য হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। আবু সুফিয়ান পেছনের দিনগুলোর দিকে ফিরে তাকান। বদরের যুদ্ধ থেকে মক্কা বিজয় পর্যন্ত তাঁর নিজের ও মুহাম্মদের (দঃ) মধ্যকার শত্রুতা, কোরায়েশ বংশের অগণিত মানুষের রক্ত দিয়ে লেখা এক দীর্ঘ ইতিহাস। চল্লিশটি বছর যে ছেলেটিকে আদরে আহ্লাদে কেউ এতোটুকু কটু কথা বলেনি, সেই হাশেমি বংশের একটা এতিম ছেলের হাতে উমাইয়া বংশের একি করুণ পরাজয়! আবু সুফিয়ান ও তাঁর পরিবারের মন থেকে সেই পরাজয়ের গ্লানি কোনোদিনই মুছে যায়নি। মুহাম্মদের (দঃ) কাছ থেকে, সরকারি উচ্চপর্যায়ে চাকুরি (সেক্রেটারি অব স্টেইট) দেয়ার অঙ্গিকার নিয়ে আবু সুফিয়ান ছেলে মুয়াবিয়াকে 'ইসলাম ধর্ম' গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। প্রথমে রাজি না হলেও পরে সুদূরপ্রসারী ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা মাথায় নিয়ে মুয়াবিয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। মুয়াবিয়া ছিলেন অত্যন্ত দূরদর্শী, উচ্চাভিলাষী, চতুর রাজনীতিবিদ। তার অধীনেই মুসলিম সৈন্যগণ ত্রিপলী, আরমানিয়া, সাইপ্রাসসহ অনেক অঞ্চল দখল করে ভারত ও চীন দখল করতে চেয়েছিল। হজরত আলি তা ভাল করেই জানেন। আলি ভাবলেন, মদিনার অলিতে-গলিতে উসমান হত্যার আহাজারি, আকাশে-বাতাসে মানুষের ক্রন্দন ধ্বনি থামতে না থামতেই আয়েশার বিরুদ্ধে করতে হলো 'জামাল যুদ্ধ'। রক্তক্ষয়ী জামাল যুদ্ধে দশ সহস্রাধিক মানুষের প্রাণনাশের পরপরই মুয়াবিয়ার সাথে আরেকটি যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া সমুচিৎ হবে না। হজরত আলি হামদান প্রদেশের গভর্নর, বনি-বাজিলা প্রধান হজরত জারিরকে মুয়াবিয়ার প্রতি একটি প্রস্তাব দিয়ে সিরিয়া পাঠালেন, 'সিরিয়ার গভর্নর যেন অনতিবিলম্বে হজরত আলির খেলাফত মেনে নিয়ে শপথ গ্রহণ করেন।' হজরত মুয়াবিয়া বিষয়টা আগেই আঁচ করতে পেরেছিলেন। সুচতুর মুয়াবিয়া হজরত জারিরকে এমন এক মায়াবী মন-মাতানো আতিথিয়েতা দিয়ে মুগ্ধ করে দিলেন যে, হজরত জারির ভুলেই গেলেন, তিনি কী জন্যে এসেছিলেন। হজরত মুয়াবিয়ার চোখ-জুড়ানো রঙিন প্রাসাদে, চিত্তরঞ্জন করে হজরত জারির (রাঃ) ফিরে আসলেন দীর্ঘ তিন মাস পরে সম্পূর্ণ ভিন্ন মানুষ হয়ে। এসে বললেন, 'মুয়াবিয়া (রাঃ) হজরত আলির সাথে রাষ্ট্রীয় কোনো বিষয় নিয়ে কোনো প্রকার আলোচনায় বসতে রাজি নন, যতোক্ষণ পর্যন্ত না হজরত উসমানের হত্যাকারীর ফাঁসি হবে।' তিনি আরও বললেন, 'এখনও হজরত উসমানের রক্তাক্ত জামা ও তাঁর স্ত্রী নায়লার কাটা আঙুল দামেস্কর মসজিদের মিনারে ঝুলছে। সিরিয়ার আপামর জনসাধারণ আল্লাহর নামে জীবনমরণ কসম খেয়েছে, যতদিন পর্যন্ত হজরত উসমানের হত্যাকারী ও হত্যার পরিকল্পনাকারীদেরকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলানো না হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত দামেস্কের মসজিদে হজরত উসমানের রক্তাক্ত জামা ও তার স্ত্রীর কাটা আঙুল ঝুলন্ত থাকবে।' সাহাবি হজরত মালিক আল আশতার (রাঃ) ভীষণ রাগান্বিত হয়ে ধমক দিয়ে হজরত জারিরকে বললেন, 'তুমি তো আমাদের প্রস্তাব মুয়াবিয়াকে আদৌ দাওনি। দীর্ঘ তিনমাস মুয়াবিয়া তোমাকে তার রাজপ্রাসাদে

[১৯] আন্তর্জালিক ঠিকানা : http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Hamza-ibn-'Abdul-Muttalib

চিত্ত-বিনোদনে মত্ত রেখে, আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সকল প্রস্তুতি সেরে ফেলেছে।' এই সেই সাহাবি হজরত মালিক আল-আশতার (রাঃ) যিনি অস্ত্রের মুখে হজরত আয়েশার দুই ভগ্নীপতি হজরত তালহা (রাঃ) ও জুবায়েরকে (রাঃ) হজরত আলির খেলাফত মেনে নিতে বাধ্য করেছিলেন। ভয়ঙ্কর মালিক আল আশতারকে হজরত জারির ভালভাবেই চেনেন। আলি যখন হজরত তালহা (রাঃ) ও জুবায়েরকে (রাঃ) তাঁর খেলাফত মেনে নিয়ে শপথ গ্রহণ করতে প্রস্তাব দেন, মালিক আল আশতার তখন তাদের মাথার ওপর উন্মুক্ত শাণিত তরবারি হাতে দণ্ডায়মান। প্রচণ্ড সাহসী বীর হজরত তালহা, যিনি ওহুদের যুদ্ধে নবীজির প্রাণরক্ষার্থে ঢাল হয়ে সামনে দাঁড়িয়ে শত্রুপক্ষের তীর বর্ষা নিজের বুকে-পিঠে গ্রহণ করেছিলেন, মালিক আল-আশতারের তলোয়ারের সামনে, আলির খেলাফত অনিচ্ছাকৃতভাবেই মেনে নিলেন। সাহাবি জুবায়েরকে জিজ্ঞাসা করায় যখন তিনি নীরব রইলেন, মালিক আল আশতার সিংহের মতো গর্জে উঠে হজরত আলিকে (রাঃ) বললেন, 'আলি (রাঃ), জুবায়েরকে আমার কাছে আসতে দিন, তার মাথাটা তলোয়ারের এক আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলি।' উল্লেখ্য, ইসলামের চার খলিফা নির্বাচনে প্রতিবারই একাধিক খলিফা পদপ্রার্থী ছিলেন, কিন্তু কোনোবারই গণতান্ত্রিক পন্থায় নির্বাচন হয়নি। নির্বাচন ইঞ্জিনিয়ারিং, কারচুপি ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করা শুরু হয়েছিল সেই প্রথম খলিফা হজরত আবু বকরের সময় থেকে। হজরত আলির বেলায়ও এর ব্যতিক্রম হয়নি। হজরত জারির বুঝতে পারলেন এখানে থাকা তার জন্যে নিরাপদ নয়। তিনি কুফা ত্যাগ করে সিরিয়া চলে যান এবং হজরত মুয়াবিয়ার সৈন্যদলে যোগদান করেন। মুয়াবিয়ার ষড়যন্ত্র ও দুষ্ট ছলচাতুরি দেখে হজরত আলি নিশ্চিত হলেন, বিষয়টার ফয়সালা অস্ত্রের মাধ্যমেই হতে হবে। সুতরাং আবারও যুদ্ধ, আবারও রক্তপাত। আলির জ্যেষ্ঠ পুত্র হজরত হাসান সিরিয়া আক্রমণ করতে পিতাকে নিষেধ করলেন। হাসান বললেন, 'পিতা, প্রয়োজন হলে খেলাফত ছেড়ে দিন, মুয়াবিয়ার সাথে যুদ্ধে যাবেন না, মুয়াবিয়া সাংঘাতিক ভয়ানক মানুষ! এ যুদ্ধে মুসলিম-জাহানের মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যাবে। আর কতো রক্তপাত, আর কতো প্রাণহানি?' হজরত আলি বললেন, 'আজ যদি মুয়াবিয়াকে ছাড় দেওয়া হয়, যদি তার চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে না পারি, অল্পদিনের মধ্যেই সারা মুসলিম বিশ্ব ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। প্রত্যেকটি প্রদেশ আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্র দাবি করে বসবে।' হজরত আলি বিলম্ব না করে পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নিয়ে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যান। আলির ইচ্ছে হলো উত্তর দিক থেকে আক্রমণ করে সিরিয়া দখল করবেন। তাই মেসোপটামিয়ান মরুভূমির মধ্য দিয়ে একদল সেনাবাহিনী অগ্রিম পাঠিয়ে দেন, কিন্তু সেনাদলটি আল ফোরাত নদীর পশ্চিম কিনারে এসে মুয়াবিয়ার একটি সেনাবাহিনীর দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। বাধ্য হয়ে তারা মেসোপটামিয়ান ফিরে যায়। এদিকে হজরত আলি মূল সৈন্যদল নিয়ে টিগরিস হয়ে পশ্চিমে মসুল এলাকার ফাঁড়ি পথে মেসোপটামিয়ান অতিক্রম করে আল-ফোরাত নদীর উপরিভাগে 'আর-রাককা' নামক স্থানে এসে উপনীত হলেন। আর-রাককা 'বালিক' ও 'আল-ফোরাত' নদীর মোহনা স্থান। অবাক বিস্ময়ে আলির সৈন্যদল লক্ষ্য করলেন নদীপাড়ে এক বিরাট মানববন্ধন তাদের পথ রুখে দাঁড়িয়ে আছে। সেনাপতি মালিক আল আশতার শাণিত তরবারি উঁচু করে তাদেরকে আক্রমণ করার হুমকি দিলেন। জনতা ভয় পেয়ে পথ ছেড়ে দিল। সিরিয়ার সীমান্ত এলাকায় পৌঁছার পথে বেশ কয়েকটি জায়গায় হজরত আলির সৈন্যদলের সাথে মুয়াবিয়ার ছোট ছোট সেনাবহিনীর খণ্ডযুদ্ধ হয়। ৩৬ হিজরির জিলহজ মাসে (৬৫৭ খ্রিস্টাব্দ), হজরত আলি তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে সিরিয়ার 'সিফ্‌ফিন' নামক স্থানে এসে মুয়াবিয়ার ১২০ হাজারের মূল সৈন্যবাহিনীর মুখোমুখি হন। ইতোমধ্যে আলির সৈন্য সংখ্যা দাঁড়ায় ৯০ হাজারে। আলি বুঝতে পারলেন চতুর্দিকে ব্যারিকেড, নদী পারে পানি-পথ বন্ধ, ১২০ হাজার সৈন্য মোতায়েন, এ সকল মুয়াবিয়ার বহুদিনের সুনিপুণ আয়োজন।

'সিফ্‌ফিন' ময়দানে এসে আলি (রাঃ) বিনা যুদ্ধে তাঁর খেলাফত স্বীকৃতি আদায়ের সকল প্রকার শেষ চেষ্টা করলেন। উসমান হত্যার বিচার করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করলেন। শান্তিপূর্ণ আলোচনার জন্যে হাতেমতাঈ পুত্র আদীর নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল পাঠালেন, নিজেও মুয়াবিয়ার কাছে ব্যক্তিগত পত্র দিলেন। কিন্তু তাঁর এই কোমলমতি আচরণ তীক্ষ্ম বুদ্ধির মুয়াবিয়ার চোখে ধুলো দিতে সক্ষম হলো না। মুয়াবিয়ার কাছে আলি মিথ্যাবাদী, প্রতারক। বসোরায় আয়েশার বিরুদ্ধে জামালযুদ্ধের সময়ে আলি প্রথমে হজরত তালহা ও হজরত জুবায়েরের প্রশংসা করে তাদের মন জয় করতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'তালহা তুমি রসুলের (দঃ) একজন বিশ্বস্ত সাহাবি, ইসলামের একজন সাহসী বীর সৈনিক। তুমি আর আমি নবীজির পাশে থেকে অনেক যুদ্ধ করেছি। তুমি না-হলে নবীজিকে ওহুদের যুদ্ধে সাহাবি হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদের (রাঃ) হাত থেকে রক্ষা করা মুশকিল হতো। উল্লেখ্য, মহাবীর খালিদ বিন ওয়ালিদ ওহুদের যুদ্ধে মুহাম্মদের (দঃ) মাথায় তরবারি দিয়ে এমন আঘাত করেছিলেন যে, নবীজির হ্যালমেট ভেদ করে মাথায় প্রচণ্ড আঘাত লাগায় তাঁর দুটি দাঁত ভেঙে গিয়েছিল। একপর্যায়ে আলি যখন বললেন, তোমরা তো স্বেচ্ছায় আমার খেলাফত মেনে নিয়েছিলে, তাহলে আজ কেন আমার বিরোধিতা করছো? হজরত তালহা ও হজরত জুবায়ের একবাক্যে চিৎকার করে বললেন, 'আল্লাহর কসম, আমাদের মাথার ওপর তলোয়ার রেখে আলি স্বীকারোক্তি আদায় করে নিয়েছিলেন।' বসোরার জনগণ বিষয়টির সত্যতা যাচাই করতে একদল লোক মদিনায় প্রেরণ করলো। খোঁজ নিয়ে দেখা গেলো, হজরত আলি শুধু তালহা ও জুবায়েরকেই নয়, অন্যান্য নেতৃপর্যায়ের লোক যারা খেলাফতের সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারেন, সকলকেই জোরপূর্বক তাঁর খেলাফত মেনে নিতে বাধ্য করেছিলেন। মুয়াবিয়া এও জানেন, তালহা ও জুবায়েরের এতো প্রশংসাকারী হজরত আলিই তাদেরকে হত্যা করে আয়েশার দুই বোনকে একসাথে বিধবার কাপড় পরিয়েছিলেন। মুয়াবিয়া মনে মনে বললেন, আলি, আয়েশার বসোরা দেখেছো, মুয়াবিয়ার

সিরিয়া দেখো নাই। আলির প্রতিউত্তরে মুয়াবিয়া জানিয়ে দিলেন, উসমান হত্যাকারীদেরকে আমার হাতে সোপর্দ না করা পর্যন্ত একটা সৈন্যও রণক্ষেত্র থেকে সরানো হবে না।' এতক্ষণে হজরত আলি বুঝলেন এখানেই হবে হয়তো তার জীবনের শেষ যুদ্ধ। এই যুদ্ধই হয়তো সূচনা করবে ইসলামের ভিন্নমুখী এক নতুন ইতিহাস। মুয়াবিয়া জানেন, উসমান হত্যাকারীদেরকে শাস্তি দেয়া আলীর পক্ষে সম্ভব নয়। আলিও জানেন তার সেনাবাহিনীর বেশিরভাগ লোকই উসমান হত্যায় জড়িত। আলির সেনাপতি মালিক আল আশতার ও মুহাম্মদ বিন আবু বকর তাদের অন্যতম। উসমান হত্যাকারীদেরকে মুয়াবিয়ার হাতে সোপর্দ করা আর প্রকারান্তরে তাঁকে খলিফা মেনে নেয়ারই সমান।

৬৫৭ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাস সৈন্য মোতায়েন, সংলাপ বিনিময়, ছোট ছোট খণ্ডযুদ্ধে অতিবাহিত হলো। মে মাসে বিশাল প্রশস্ত সিফ্‌ফিন মাঠ, ইসলামের ইতিহাসের সর্ববৃহৎ সেনাদলের পদাঘাতে থরথর করে কেঁপে উঠলো। বর্শা আর তরবারির ঝনঝনানী শব্দে, রণবাদ্যের হুংকারে স্তব্ধ হয়ে যায় জগতের পশুপক্ষী, জীবজন্তুর কলরব। হজরত মুয়াবিয়া তাঁর ১২০ হাজার সৈন্যকে ৮জন সেনাপতি দিয়ে ৮টি দলে বিভক্ত করলেন। অপরপক্ষে আলিও তাই করলেন। যুদ্ধের এই অভূতপূর্ব দৃশ্য, এই বিশাল আয়োজন দেখে উভয় পক্ষই আতঙ্কিত হলো, এই বুঝি ইসলাম ও মুসলিম জাতি বিশ্বের মানচিত্র থেকে বিলীন হয়ে যায়! কেউই পুরোদমে (Full scale) যুদ্ধ শুরু করতে চাইলো না। বিচ্ছিন্নভাবে সেক্টর ভিত্তিক যুদ্ধ চললো পুরো একমাস। আসলো জুন, ৩৭ হিজরির পবিত্র মহর্‌রম মাস। উভয় পক্ষই যুদ্ধবিরতি চাইলো। হজরত আলি পুনরায় সংলাপের মাধ্যমে বিষয়টার সমাধান চাইলেন। চতুর মুয়াবিয়া বিরতির সময়টাকে প্রপাগাণ্ডা ছড়ানোর কাজে লাগালেন। আলির সৈন্যদলে যারা উসমান হত্যার বিচার কামনা করে, তাদেরকে বুঝাতে সক্ষম হলেন যে, আলি সত্যিকার অর্থে উসমান হত্যার বিচার করবেন না, কারণ হত্যাকারীরা আলির আত্মীয়, আলি তাদেরকে চেনেও না-চেনার ভান করেন। খলিফা উসমান হত্যাকারীদেরকে গ্রেফতার করাতো দূরে থাক বরং অনেককে তিনি সেনাবাহিনীতে ভর্তি করে পুরস্কৃত করেছেন। আলির কিছু লোক তাঁর ওপর সন্দেহ পোষণ করতে শুরু করলো। উভয় পক্ষের সংলাপ চলতে থাকলো। এক পর্যায়ে সিরিয়ার সংলাপ প্রতিনিধিদল আলিকে প্রশ্ন করেন, 'আলি, আপনার দৃষ্টিতে খলিফা উসমানকে হত্যা করা কি ন্যায়-সঙ্গত ছিল'? আলি জবাব দেন, 'এ ব্যাপারে আমি এখন কিছু বলবো না।' মুয়াবিয়ার প্রপাগাণ্ডার বৃক্ষে ফল ধরতে শুরু করলো। আলির সকল প্রকার চেষ্টাই ব্যর্থ হলো। তিনি দেখলেন এখান থেকে বিনা যুদ্ধে পরিত্রাণ পাওয়ার সকল পথ মুয়াবিয়া বন্ধ করে দিয়েছেন। আরবি সফর মাসে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। প্রতিদিন উভয় পক্ষে শতশত প্রাণহানি ঘটতে থাকলো। আলির সেনাপতি হজরত মালিক আশতার (রাঃ) একাই একদিনে, প্রতিবার 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি উচ্চারণ করে এক-এক করে ৪০০জন শত্রুর মস্তক কেটে ফেলতে সক্ষম হয়েছিলেন। মুয়াবিয়ার একজন সৈন্য আলির পেছনে ধাওয়া করে এসেছিল। আলি তলোয়ার দিয়ে তার পেট বরাবর এমন শক্ত কোপ মেরেছিলেন, চোখের পলকে লোকটির শরীরের নীচভাগ ঘোড়ার পিঠে রেখে উপরিভাগ মাটিতে পড়ে যায়। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত, সন্ধ্যা থেকে ভোর পর্যন্ত বিরামহীন যুদ্ধ চললো। দিনে দিনে প্রাণহানির সংখ্যা বাড়তেই থাকলো। তবে তুলনামূলকভাবে মুয়াবিয়ার দিকে হতাহতের সংখ্যা ছিল বেশি। আলির সেনাপতি হজরত মালিক আশতার (রাঃ) ইঙ্গিত করলেন, বিজয় নিকটবর্তী। মুয়াবিয়া রণক্ষেত্র ত্যাগ করে পলায়নের কথা ভাবছিলেন, ঠিক সেই সময়েই মুয়াবিয়ার সেনাপতি সাহাবি হজরত আমর ইবনে আস (রাঃ) তাদের শ্রেষ্ঠ প্রতারণার অস্ত্রটি ব্যবহার করার অনুমতি চাইলেন। মুয়াবিয়ার অনুমতি নিয়ে হজরত আমর ইবনে আস তাঁর সৈন্যবাহিনীর বর্শার ফলকে ৫০০ কপি কোরান গেঁথে দিয়ে উড়াতে নির্দেশ দিলেন। আলির সেনাবাহিনী থমকে গেল, বিষয়টা কি? আমর ইবনে আ'স বললেন, 'আর রক্তপাত নয়, উভয় পক্ষের অসংখ্য মুসলমান নিহত হয়ে গেছেন। আমরা অস্ত্র নয়, কোরানের মাধ্যমে ফয়সালা চাই। হজরত আলি তাঁর সিপাহীদেরকে নিষেধ করলেন, 'সাবধান মুয়াবিয়ার প্রতারণায় কর্ণপাত করো না, এ নিছক প্রতারণা বৈ কিছু নয়।' বেশকিছু সৈন্য আলির কথা অমান্য করে যুদ্ধ বন্ধ করে দিল। আলির সেনাপতি হজরত মালিক আশতার দৌড়ে এসে বললেন, 'আল্লাহর কসম, আরো কিছুক্ষণ সময় তোমরা ধৈর্য্য সহকারে যুদ্ধ চালিয়ে যাও, বিজয় আমাদের অনিবার্য।' এক নাগাড়ে একমাস যুদ্ধ করে অবশ ক্লান্ত দেহের আলির একদল সৈন্য হাতের অস্ত্র ছেড়ে দিয়ে বললো, 'আমরা অস্ত্রের চেয়ে কোরানের মাধ্যমে ফয়সালা শ্রেষ্ঠ মনে করি।' চতুর্দিক দিক থেকে 'আল্লাহর আইন, কোরানের ফয়সালা' চিৎকার ধ্বনি শুনা গেলো। আলি পুনরায় যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলে তার দলের কিছু লোক, এই বলে আলির ওপর অভিযোগ আনলো যে, আলি ইচ্ছে করেই ক্ষমতার লোভে মুসলিম জাতিকে এ যুদ্ধে লিপ্ত করেছেন এবং তিনি উসমান হত্যার বিচার মোটেই চান না। আলিকে বাধ্য হয়ে যুদ্ধ বন্ধ করতে হলো। বনি-কিন্দা প্রধান হজরত আল-আশা'ত মুয়াবিয়াকে জিজ্ঞেস করেন : '৫০০ খানি কোরান বর্শার মাথায় গাঁথার মানেটা কি? মুয়াবিয়া বললেন, 'আল্লাহর ইচ্ছের ওপর, তাঁর কোরানে লিখিত সমস্যার সমাধান খোঁজা আমাদের উচিৎ।' কোরানকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করেও মুয়াবিয়া কোরানিক সমাধানটা নিজেই দিয়ে দিলেন। বললেন, 'উভয় পক্ষ নিজ নিজ দল থেকে একজনকে প্রধান করে মধ্যস্থতাকারী কমিটি গঠন করা হউক। মধ্যস্থাতাকারী দুই প্রধান যে সিদ্ধান্ত দেবেন তা উভয় পক্ষকে মেনে নিতে হবে।' আলির লোকজন সমস্বরে বলে উঠলেন : 'আমরা মানি, আমরা মানি।' বৈঠক বসার আগে হজরত মুয়াবিয়া অতি গোপনে দুটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সেরে ফেললেন। হজরত উসমানের সময়ের মিশরের গভর্নর হজরত আমরকে বললেন, 'বৈঠকে সিদ্ধান্ত যাই হোক তুমি মিশর ছাড়বে না।' হজরত আমর বললেন, 'যদি মিশর আলির দখলে চলে যায়?' সর্বপ্রথম মিশর

আক্রমণ করা হবে, তোমরা প্রস্তুত থেকো। মুয়াবিয়া হজরত আমরকে আশ্বস্ত করলেন। আলির পক্ষে মধ্যস্থতাকারী দল-প্রধানও মুয়াবিয়ার তৈরি। আলি প্রস্তাব করলেন, দল-প্রধান হিসেবে প্রবীণ নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের (রাঃ) নাম। আলির লোকেরা প্রতিবাদ করলো। তারা প্রস্তাব করলো মুয়াবিয়ার সমর্থক হজরত আবু মুসা আশারির (রাঃ) নাম। আলি বললেন : 'সর্বনাশ, আবু মুসা আশারি একজন দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক। তাকে আমি কুফার অস্থায়ী গভর্নর করে পাঠিয়েছিলাম। সে আমার খেলাফত অস্বীকার করায় এই সেদিন আমি তাকে ক্ষমতাচ্যুত করেছি।'

(৮)

এক সময়কার হজরত আলির অন্ধসমর্থনকারী কুফাবাসীও আজ আলির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠলো। তারা বললো, 'আলি তোমারই কারণে আয়েশার বিরুদ্ধে জামাল যুদ্ধে কুফার হাজার হাজার নারী বিধবা হয়ে কাঁদছে, তাদের চোখের জল আজও শুকায়নি।' ৬৫৮ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি (৩৭ হিজরির রমজান মাস) ঐতিহাসিক 'আলি-মুয়াবিয়া' শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয়। উভয় পক্ষের সত্তর হাজার মানুষের রক্তে আজ স্যাত স্যাতে পিচ্ছিল সিফ্ফিনের বিশাল সবুজ মাঠ। এর আগে ইসলামের ইতিহাসে এতো বড় হত্যাকাণ্ড আর কখনো ঘটেনি। হজরত আলির ২৫ হাজার আর হজরত মুয়াবিয়ার পক্ষের ৪৫ হাজার মানুষের গলাকাটা লাশ পড়ে রইলো সিফ্ফিন প্রান্তরে। সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর দেখতে মক্কা, মদিনা, সিরিয়া, কুফা, বাসরা, মিশরসহ রাজ্যের সকল প্রদেশ থেকে হাজার হাজার মানুষ এসে জড়ো হলো। কোনো এক গোপন রহস্যে হজরত মুয়াবিয়া, 'সন্ধিপত্র' লেখার দায়িত্ব গ্রহণের জন্যে আলির পক্ষকে অনুরোধ করলেন।

তারা সন্ধিপত্র তৈরি করতে থাকুন, ইত্যবসরে আসুন দেখা যাক, যুদ্ধের মাঠে ও যুদ্ধের নিকটবর্তী সময়ে কে, কোথায়, কি বলেছিলেন : হজরত আম্মার (রাঃ) তাঁর অধীনস্থ আলির একদল সৈন্যকে যুদ্ধে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ভাষণ দিচ্ছিলেন, 'বন্ধুগণ, তোমরা কি শুনো নাই, নবীজি জীবিতকালে বহুবার বলেছেন, যে লোক আমার আলিকে দুঃখ দেবে, মনে করো সে আমাকেই দুঃখ দিল, যে লোক আমার আলির বিরুদ্ধাচরণ করবে, মনে করো সে আমারই বিরুদ্ধাচারণ করলো। তোমরা কি জানো না এই মুয়াবিয়া একজন বিধর্মী, ইসলামের শত্রু, সে আল্লাহ ও আল্লাহর রসুলের প্রেমে ইসলাম গ্রহণ করে নাই। ? তার রাজপ্রাসাদে অমুসলিম নারীদের আনাগোনা, বিধর্মীদের সাথে তার মেলামেশা। আমরা জেহাদ করছি নবীজির শত্রুদের বিরুদ্ধে, বিধর্মী শাসকের হাত থেকে ইসলামকে বাঁচাতে।' হজরত আম্মারের (রাঃ) কথা সম্পূর্ণই সত্য। মুয়াবিয়া এবং তাঁর পিতা আবু সুফিয়ান স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন নাই। ঘটনাটি ছিল এরকম : মক্কা বিজয়ের পরপরই নবী মুহাম্মদ (দঃ) কোরায়েশ নেতা আবু সুফিয়ানকে তাঁর একটি খাস কামরায় তলব করলেন। বুদ্ধিমান আবু সুফিয়ান ঘরে ঢুকেই ঘরের পরিবেশ দেখে অনুমান করতে পারলেন, কি জন্যে তাঁকে ডাকা হয়েছে? মুহাম্মদের (দঃ) ডানে বামে দুইজন লোক দাঁড়িয়ে আছেন। হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাদের একজন। ইবনে আব্বাসের চাদরের নিচে তলোয়ার লুকানো। কোরায়েশ নেতার বুঝতে বাকি রইলো না মুহাম্মদ (দঃ) তাকে কি প্রশ্ন করবেন : মাথা দেবে, না মুহাম্মদের অধীনতা মেনে নেবে? আবু সুফিয়ান অধীনতা মেনে নিলেন। ঘরে গিয়ে পুত্র মুয়াবিয়াকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পরামর্শ দিলেন। মুয়াবিয়া বললেন, 'একি বলছেন আপনি? এই সেদিন বদরের যুদ্ধে আপনার চোখের সামনে মুহাম্মদ আমার দুটি ভাইকে খুন করেছেন। আপনি নিজের হাতে আপনার ছেলেদেরকে দাফন করেছেন। পুত্রশোকে মা (হিন্দা) আমার পাগলবেশে মক্কার অলিতে-গলিতে গড়াগড়ি করেছেন। ইসলাম গ্রহণ করবো না, আমি এর প্রতিশোধ নিবো।' আবু সুফিয়ান বললেন, 'শত্রুকে শক্তিবলে পরাজিত করতে না পারলে, তার দলে যোগদান করা বুদ্ধিমানের কাজ। প্রতিশোধ নেয়ার সময় একদিন আসতেও পারে।'

হজরত ওবায়দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) মুয়াবিয়ার সৈন্যদলের এক সেক্টর কমান্ডার ছিলেন। ওবায়দুল্লাহ, খলিফা হজরত ওমরের (রাঃ) সেই খুনি পুত্র, যিনি উসমানের শাসনামলে তিনটি নিরপরাধ মানুষের খুনের আসামি, যাকে জনতার আদালতে হজরত আলি মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন, আর হজরত উসমান তাকে বেকসুর খালাস দিয়েছিলেন। আজ সিফ্ফিনের ময়দানে সাহাবি হজরত ওমরের (রাঃ) পুত্র ওবায়দুল্লাহ ও সাহাবি হজরত আবু বকরের (রাঃ) পুত্র মুহাম্মদ একে অপরকে বধ করতে অস্ত্র হাতে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। হজরত ওবায়দুল্লাহ ইবনে ওমর তাঁর সৈন্যদেরকে বলেন, 'আমিরুল মোমেনিন হজরত মুয়াবিয়ার সমর্থক সিপাহী সাথীরা, আমার চক্ষের সামনে হজরত উসমানের খুনিকে (মুহাম্মদ ইবনে আবু বকরকে ইঙ্গিত করে) স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি। যে সকল খুনিদের বিচার হজরত আলি করতে পারেননি, আজ এই মাঠে তাদেরকে হত্যা করে আমরা খলিফা উসমানের হত্যার প্রতিশোধ নিবো, আমরা ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবো।' ওবায়দুল্লাহর সেই সাধ পূরণ হয়নি। কিছুক্ষণ পরেই আলির সৈন্যের তীরের আঘাতে তার সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায়। ওবায়দুল্লাহর মরদেহ কেউ না তুলেই পলায়নের পথ খোঁজছিল। ওবায়দুল্লাহ যা বলছিলেন, তা আংশিক সত্য। মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর হজরত উসমান হত্যায় জড়িত ছিলেন কিন্তু আলির ৯০ হাজার সৈন্যদলের সবাই উসমান হত্যার পক্ষে ছিলেন না। সত্য কথা হলো, মুয়াবিয়ার দলেও উসমান হত্যায় জড়িত অনেক লোক ছিলেন। মুয়াবিয়া অতি কৌশলে কিছু লোককে

সোনা-দানা, টাকা-পয়সা ইত্যাদি দিয়ে, যাকে যেভাবে পারেন লোভ-প্রলোভন দেখিয়ে তার পক্ষে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। সুতরাং হজরত আলি (রাঃ) খলিফা উসমান হত্যার বিচার করলেও সিফ্‌ফিন যুদ্ধ এড়াতে পারতেন না।

মহর্‌রম মাসে যুদ্ধ বিরতির সময়ে মুয়াবিয়ার এক যোদ্ধাকে হজরত হাশিম ইবনে উতবা (রাঃ) বলেন, 'তোমাদের হয়েছেটা কি? তোমরা কেন বোঝতে পারছ না, উসমানকে কেন আমরা হত্যা করেছি। উসমান নিজের পছন্দের লোক দিয়ে কোরান লিখিয়েছেন। নবী পরিবার ও কোরানের অবমাননা করেছেন, আগুন দিয়ে কোরান পুড়িয়েছেন। যারা জালিম খলিফা উসমানকে হত্যা করে নবীর শরিয়ত প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তারা তো নবীর বিশ্বস্ত লোক। তোমরা কি নবী পরিবারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবে?'

হজরত আলি একে একে বেশ কয়েকজন সাহাবির নাম উল্লেখ করে তাদের চারিত্রিক পরিচয় দিলেন। তন্মধ্যে মুয়াবিয়া, হজরত আমর ইবনে আস, হজরত আবি মুয়াত, হজরত ওবায়দুল্লাহ ইবনে ওমর, হজরত আব্দুল্লাহ বিন সাদ বিন আবি সারাহ্, হজরত হাবিব মাসলামাহ অন্যতম। আলি বললেন, 'মুয়াবিয়া বিধর্মী, ওবায়দুল্লাহ সর্বজন নিন্দিত সন্ত্রাসী, খুনী, আমর ইবনে আস লুটেরা, ডাকু স্বৈরাচারী, আব্দুল্লাহ বিন সাদ বিন আবি সারাহ্ নিজে কোরান লিখে এখনো কোরান আল্লাহর বাণী বলে বিশ্বাস করে না, আবি মুয়াত ও হাবিব মাসলামাহ্ দেশদ্রোহী, মিথ্যাবাদী, বিশ্বাসঘাতক। তোমরা সবাই এদেরকে না চিনলেও আমি ছোটবেলা থেকে এদেরকে চিনি, জানি। তোমরা বিশ্বাস করো, এ জেহাদ মিথ্যের বিরুদ্ধে সত্যের জেহাদ, এ জেহাদ অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের জেহাদ।'

শেষ পর্যন্ত ৭০ হাজার মানুষের প্রাণনাশের পর যুদ্ধ থামলো। এবার সন্ধিপত্র লেখা হবে। মক্কা, মদিনা, কুফা, সিরিয়ার বড় বড় প্রবীণ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত। লেখক লেখা শুরু করলেন : 'পরম করুণাময় আল্লাহর নামে, এই মর্মে আমিরুল মোমেনিন হজরত আলি (রাঃ) ইবনে আবি তালিব ও হজরত মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান...' থামুন! বজ্রকণ্ঠে আমর বিন আস লেখককে থামিয়ে দেন। কি ব্যাপার? লেখক জিজ্ঞেস করেন। আমর বলেন, 'আমিরুল মোমেনিন হজরত আলি (রাঃ) লাইনটি কেটে ফেলা হউক। আলি তোমাদের আমিরুল মোমেনিন হতে পারেন, আমাদের নন।' সঙ্গে সঙ্গে হজরত আলির বুকটা ছ্যাৎ করে ওঠে! যেন একটা বিষ-মাখানো তীর তাঁর বুক ভেদ করে পৃষ্ঠদেশ দিয়ে বেরিয়ে গেলো। আলি বুঝলেন মুয়াবিয়া বহুদিনের পুরনো একটি ঘটনার হুবহু পুনরাবৃত্তি ঘটালো : সেদিন মুহাম্মদ (দঃ) ও আবু সুফিয়ানের মধ্যকার ঐতিহাসিক 'হুদাইবিয়া-সন্ধি'কালে একই ঘটনা ঘটেছিল। ঐ দিন কলম ছিল আলির হাতে। আলি লিখছিলেন, 'পরম করুণাময় আল্লার নামে, এই মর্মে আল্লাহর রসুল মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ্ ও আবু সুফিয়ান ইবনে...' থামুন! আবু সুফিয়ান ধমক দিয়ে বলেছিলেন, 'আল্লাহর রসুল কথাটি বাদ দিয়ে শুধু মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ লেখা হউক, মুহাম্মদ তোমাদের রসুল হতে পারেন, আমাদের নয়।' হজরত আল আহনাফ (রাঃ) বললেন, 'দোহাই আপনাদের, হজরত আলির নাম থেকে 'আমিরুল মোমেনিন' উপাধিটি মুছে ফেলবেন না, নবী বংশকে জগৎ থেকে চিরদিনের জন্যে মুছে ফেলার এ এক জঘন্য ষড়যন্ত্র।' নবীজির কথা মনে পড়ায় আলির চোখের জলের বাধ ভেঙে যায়। ফোটা দু-এক অশ্রু গাল বেয়ে তার দাড়ি ভিজিয়ে দিল। জীবনে নবীজি দুজন মানুষকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন, একজন আলি আর একজন হজরত ফাতিমা (রাঃ)। বহু কষ্টে নিজেকে সংযত করে, 'হুদাইবিয়া-সন্ধি'কালে নবীজি যেভাবে বলেছিলেন, ঠিক সেভাবেই আলি বললেন, 'ঠিক আছে 'আমিরুল মোমেনিন' কথাটি কেটে দেয়া হোক।' উভয়পক্ষের প্রতিনিধি প্রধানগণ পরামর্শ দিলেন, যতদিন পর্যন্ত কমিটি তাদের সিদ্ধান্ত ব্যক্ত না করেছেন, ততদিন পর্যন্ত আলির লোকজন আলিকে ও মুয়াবিয়ার লোকজন মুয়াবিয়াকে তাদের খলিফা হিসেবে মেনে চলবে। কেউ কাউকে আক্রমণ করতে পারবে না। কমিটি সিদ্ধান্ত প্রকাশ করার সময় নিলেন কমপক্ষে ছয় মাস। এবার নিজ নিজ লাশ গ্রহণের পালা। মানুষের রক্তে পিচ্ছিল মাঠ, হাটতে গিয়ে অনেকেই বারবার হোঁচট খেল। উভয়পক্ষের সত্তর হাজার মানুষ আর গৃহে ফিরে এলো না। স্বামীহারা বিধবাদের আর্তচিৎকার, পিতৃহারা শিশুদের ক্রন্দনরোল শুনা গেল আরব দেশের ঘরে ঘরে বহুদিন।

কয়েক মাস পর আজ তত্ত্বাবধায়ক কমিটি কোরান নিয়ে বসেছেন কোরানিক ফয়সালা দিতে। হায়রে জগতের অভাগা মুসলমান! আজ অবধি তারা বুঝতে সক্ষম হলো না, রমজান মাসের যে দিন থেকে কোরান নামক বইখানি আরবের বুকে তৈরি হলো, সেদিন থেকে শান্তি নামের সুখ-পাখিটি আরব ছেড়ে লক্ষযোজন দূরে চলে গেছে! মুয়াবিয়ার প্রতিনিধি প্রধান সিংহরূপী আমার ইবনে আস-এর সামনে, আলির প্রতিনিধি প্রধান আবু মুসা 'মুষিক ছানা'র সমান। প্রবীণ নেতা আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) আবু মুসাকে ধূর্ত আমর (রাঃ) সম্পর্কে সতর্ক করে দিলেন। তিনি বললেন, 'সাবধান আবু মুসা, এই ধূর্ত মানুষটা মিশরের গভর্নর থাকাকালীন সময়ে খলিফা উসমানও তাঁকে ভয় পেতেন। খলিফার নিযুক্ত মিশরের গভর্নর আব্দুল্লাহ বিন সাদ বিন আবি সারাহ্‌কে বাধ্য করেছিল তার সাথে ক্ষমতা ভাগাভাগি করতে, আমর ইবনে আস (রাঃ), হজরত আবু মুসাকে এক গোপন বৈঠকে আহ্বান করলেন। মুয়াবিয়ার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আমর, আবু মুসাকে মাত্রাতিরিক্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা দেখালেন। শাহী ভোজন ও আপ্যায়ন পর্ব সমাপন করে আমার ইবনে আস (রাঃ), আবু মুসাকে জিজ্ঞেস করেন, 'আপনার কি মনে হয় আলি কোনোদিন উসমান হত্যার বিচার করবেন?' আবু মুসা উত্তর দেন, 'উসমান হত্যা পূর্ব সময় থেকে এ পর্যন্ত যা কিছু হয়েছে, আমি মনে করি এসব কিছুর জন্যে হজরত আলি ও মুয়াবিয়া সমভাবে

দায়ী।' এ উত্তরটাই হজরত আমর ইবনে আস কামনা করেছিলেন। তারিখ ঘোষণা করে সমাবেশ ডাকা হলো বিচারকদের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা হবে। সমাবেশে আমর ইবনে আস খুব নম্র ভাষায় বিনীত ভঙ্গিতে অনুরোধ করলেন আবু মুসা যেন প্রথম বক্তব্য প্রদান করেন। আবু মুসা ঘোষণা দেন : "আমারা তত্ত্বাবধায়ক কমিটি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, আজ থেকে আলি ও মুয়াবিয়া উভয়ের খেলাফত অবৈধ ঘোষণা করা হলো। সাধারণ নির্বাচানের মাধ্যমে জনগণ নতুন খলিফা নির্বাচিত করবেন।" তারপরই আমর ইবনে আস তার বক্তব্যে ঘোষণা দেন, 'আবু মুসার সাথে আমিও একমত। রাজনীতিতে আলি সম্পূর্ণই নতুন। খলিফা হওয়ার যোগ্যতা তাঁর এখনও হয়নি। কিন্তু এই মুহূর্তে রাজ্যের আইন-প্রশাসন বলতে কিছুই নেই। জাতি আজ এক অশুভ রাহুগ্রস্থ। এই সঙ্কটময় দিনে আমিরুল মোমেনিন হজরত মুয়াবিয়ার মতো একজন বিচক্ষণ-দক্ষ রাজনীতিবিদ আমাদের প্রয়োজন।' বিনা মেঘে বজ্রপাত হলো আবু মুসার মাথায়। গালি দিয়ে ওঠলেন অশ্লীল ভাষায়। শুরু হলো কোরানের 'কালাম-যুদ্ধ'। দুনিয়ার যত অশ্লীল গালি আছে তারা ছুঁড়তে থাকলেন একে অপরের প্রতি। আলির প্রতিনিধি দল চিৎকার করে তেলাওত করলেন কোরানের (৭নং) সুরা আ'রাফের ১৭৫নং আয়াতটি : "তাদেরকে তুমি সেই লোকের কথা শোনাও যাকে আমি নিদর্শনাবলি দিয়েছিলাম, কিন্তু সে তা বর্জন করে, (আর কেমন ক'রে) শয়তান তার পিছনে লাগে এবং সে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়।"[২০] আলির সমর্থকগণ মিছিল বের করে শ্লোগান দিতে থাকে 'মুয়াবিয়া শয়তান! মুয়াবিয়া শয়তান!' অপরপক্ষে মুয়াবিয়ার লোকজন নিয়ে এলো (৬২নং) সুরা আল জুম্আ ৫ ও ৬ নং আয়াত দুটো : "যাদেরকে তৌরাতের ভার দেওয়া হয়েছিল তারপর তারা তা অনুসরণ করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে বই বওয়া গাধার মতো। কত নিকৃষ্ট তাদের দৃষ্টান্ত যারা আল্লাহর নির্দেশাবলী প্রত্যাখ্যান করে। আর আল্লাহ অন্যায়কারীকে সৎপথে চালান না।" এবং "বলো, ওহে, যারা ইহুদি-মত পোষণ করো, যদি তোমরা মনে করো যে, তোমরাই আল্লাহর বন্ধু-বান্ধব, অন্য কোনো লোকজন নয়, তাহলে তোমরা মৃত্যু কামনা করো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।"[২১] কোরান থেকে 'কালাম-যুদ্ধ' করতে করতে তারা কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারলেন না। সম্মেলন ভঙ্গ হয়ে যায়। শান্তি প্রদানে ব্যর্থ কোরান বুকে নিয়ে তারা বাড়ি ফিরলেন। হজরত আলি কুফায় বসে সম্মেলনের এ সংবাদ শুনে খুবই আহত হলেন। আকাশ পানে দু'হাত তুলে লম্বা একটি দোয়া করলেন: 'হে দয়াময়, মহাশক্তিমান প্রভু, তোমার সর্বনিকৃষ্ট গজব অর্পিত করো তাদের ওপর, বিশেষ করে মুয়াবিয়া, আমর ইবনে আস, আবুল আওয়ার আল সুলাইমি, আব্দুল্লাহ বিন সাদ বিন আবি সারাহ্, হাবিব ইবনে মাসলামাহ, আব্দুর রহমান বিন খালিদ, জাহাক বিন কায়েস আর অলিদ বিন উকবার ওপর।'

(৯)

আলির এই দোয়া আল্লাহর কাছে পৌঁছিল কী-না জানা যায়নি, তবে মুয়াবিয়ার কানে যথাসময়েই পৌঁছিল। মুয়াবিয়া জুমার নামাজের জন্যে খুতবায় নতুন কিছু আয়াত সংযোজন করতে তার সেক্রেটারিকে নির্দেশ দিলেন। মুয়াবিয়া সেদিন থেকে আইন করে প্রতি শুক্রবার খুতবায়, নবী পরিবার অর্থাৎ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, হজরত হামজাহ, হজরত আলি, হজরত ফাতিমা, হজরত হাসান ও হোসেনকে অভিশাপ দেয়া বাধ্যতামূলক করে দেন। হযরত হুজুর ইবনে আদি নামের একজন সাহাবি মুয়াবিয়ার এ আদেশ অমান্য করায় মুয়াবিয়া তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেন। আমরা এখানে বিশিষ্ট ইসলামি পণ্ডিত আবুল আলা মৌদুদির '*খেলাফত ও রাজতন্ত্র*' গ্রন্থে থেকে উক্ত ঘটনাটি সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরছি[২২] : "হযরত মুয়াবিয়ার (রাঃ) শাসনামলে খুতবায় প্রকাশ্যে মিম্বারে হযরত আলি (রাঃ)-এর লানত (অভিসম্পাত) এবং গালিগালাজের সিলসিলা শুরু হলে অনেকেই অতি কষ্টে চুপ করে থাকতেন। কিন্তু কুফা নগরীতে নবীজির অন্যতম সাহাবি হজরত হুজর ইবনে আদি (রাঃ) মুয়াবিয়ার এ নির্দেশ প্রত্যাখান করে হজরত আলির (রাঃ) প্রশংসা করতে লাগলেন। হজরত মুগিরা (রাঃ) কুফার গভর্নর থাকালীন সময়ে ইবনে আদির কোন অসুবিধা হয়নি কারণ তখনও কুফায় খুৎবায় অভিশাপ দেয়ার প্রচলন শুরু হয়নি। কিন্তু বসোরার গভর্নর হজরত জিয়াদের (রাঃ) আমলে কুফাকে যখন বসারার অন্তর্ভুক্ত করা হয়, জিয়াদ (রাঃ) জুমার খুতবায় হজরত আলিকে অভিশাপ দেয়া শুরু করে দেন। হুজর ইবনে আদি (রাঃ) এর প্রতিবাদ করলেন। একদিন ইবনে আদি (রাঃ) হজরত যিয়াদকে জুমার নামাজে দেরি করে না আসার জন্য সতর্ক করেন। হজরত জিয়াদ (রাঃ) ইবনে আদি ও তাঁর ১২জন সঙ্গী-সাথীর ওপর মিথ্যা দেশদ্রোহিতা ও খলিফা মুয়াবিয়াকে অভিশাপ দেয়ার অভিযোগ এনে তাদেরকে গ্রেফতার করে

[২০] ইউসুফ আলি অনূদিত আয়াতটি হচ্ছে : "Relate to them the story of the man to whom We sent Our signs, but he passed them by: so Satan followed him up, and he went astray." (7:175).

[২১] ইউসুফ আলি অনূদিত ইংরেজি আয়াত দুটি হচ্ছে : "The similitude of those who were charged with the (obligations of the) Mosaic Law, but who subsequently failed in those (obligations), is that of a donkey which carries huge tomes (but understands them not). Evil is the similitude of people who falsify the Signs of Allah: and Allah guides not people who do wrong." Say: "O ye that stand on Judaism! If ye think that ye are friends to Allah, to the exclusion of (other) men, then express your desire for Death, if ye are truthful!" (62:5-6).

[২২] সাইয়েদ আবুল আলা মৌদুদি, (অনুবাদ : গোলাম সোবহান সিদ্দিকী), *খেলাফত ও রাজতন্ত্র*, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃষ্ঠা ১৬২-১৬৩।

মুয়াবিয়ার নিকট সিরিয়া পাঠিয়ে দেন। মুয়াবিয়া ৫১ হিজরিতে অভিযুক্ত ৮ জনকে মৃত্যুদণ্ড শাস্তি দেন। তাদের একজন সাথী হজরত আব্দুর রহমান ইবনে হাসানকে হজরত মুয়াবিয়া গভর্নর জিয়াদের নিকট ফেরত পাঠান। জিয়াদ তাঁকে জীবন্ত মাটিতে পুঁতে ফেলেন।"

যাহোক, সম্মেলনের সংবাদ শুনে কুফার জনগণ কয়েক দলে বিভক্ত হয়ে যায়। হজরত আলি চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলেন। মুয়াবিয়ার সাথে সন্ধি স্থাপনের অজুহাতে 'খোরাইজ' গোত্র সরাসরি আলির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে দিলো। মধ্যপথে বিজয়ক্ষণে যুদ্ধ থামিয়ে দেয়ায় আরেক দল অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলো। অনেকে প্রকাশ্যে বলাবলি করতে লাগলো মুয়াবিয়া একজন সুদক্ষ, শক্তিশালী শাসক। দিন যত যায়, মুয়াবিয়ার দল বড় ও শক্তিশালী হতে থাকলো আর আলির খেলাফতের প্রাচীর ভেঙে একটি একটি করে ইট খসে পড়তে থাকলো। কিন্তু আলি থেমে যাওয়ার পাত্র নন। মুহাম্মদের (দঃ) রক্ত তাঁর শিরা-উপশিরায়। হজরত আলি মরণপণ প্রতিজ্ঞা করলেন, এ অপমানের প্রতিশোধ নেবেন। বিদ্রোহী চরমপন্থী মৌলবাদী (Extermist Fundamentalist) 'খোরাইজ' বা খারিজি দল আলি ও মুয়াবিয়া উভয়কে প্রত্যাখ্যান করে নিজস্ব একটি দল গঠন করলো। তারা আল্লাহর হুকুমত, কোরানের শাসন কায়েম করতে চায়। তাদের মতে আলি ও মুয়াবিয়া দুজনই কোরান-বিরোধী শাসক। সিফ্ফিনের যুদ্ধ পর্যন্ত এরা আলির পক্ষেই ছিল। যেহেতু আলি, মুয়াবিয়ার মতো একজন বিধর্মীর সাথে শান্তিচুক্তিতে দস্তখত করেছেন এবং রাজ্যে শরিয়ার আইন প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছেন, সুতরাং তাদের দৃষ্টিতে হজরত আলিও একজন বিধর্মী। খারিজি দল 'হারোরা' নামক একটি গ্রামে সমেবেত হয়ে তাদের মতাদর্শ প্রচার করতে লাগলো। কিছুদিনের মধ্যেই তারা এক ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসী জঙ্গিবাদী দলে পরিণত হলো। তাদের সাথে ভিন্নমত পোষণকারীদের বাড়িঘর আগুনে পুড়িয়ে, মানুষের গলা কেটে, জীবন্ত মাটিতে পুঁতে, নির্বিচারে হত্যা করে সারা এলাকায় ত্রাসের সৃষ্টি করে দেয়। হজরত আলি দিবস-রজনী কষ্ট করে, বাড়ি বাড়ি ঘুরে তাবলিগ করে কিছু লোককে পুনরায় সিরিয়া আক্রমণের জন্যে রাজি করিয়েছিলেন। তিনি দেখলেন, এখন তাঁর সামনে সিরিয়া আক্রমণের চেয়ে বিদ্রোহী খারিজি দলকে দমন করা আবশ্যক হয়ে গেছে। এদিকে খারিজিরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে, মুয়াবিয়া, আলি ও আমার ইবনে আস এই তিনজনকে হত্যা না করা পর্যন্ত তারা ঘরে ফিরবেন না। তাদের শ্লোগান হলো 'লা হুক্‌মা ইল্লা লিল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহর শাসন ছাড়া কোনো শাসন নাই। তাদের মতে 'সব মুমিন মুসলমান যখন সমান, এক আল্লাহ বরাবর তখন কোনো খলিফারই দরকার নেই, কোনো মানুষের হাতে বায়েত গ্রহণের নেই কোনো প্রয়োজন। জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত শাসন-পরিষদের হাতে থাকবে দেশ শাসনের দায়িত্ব।' হজরত আলি তাদের কাছে লোক পাঠালেন, বুঝাতে চেষ্টা করলেন যে, তিনি কোরানের খেলাফ কোনো কাজ করেন নাই। ব্যক্তিগত পত্র লিখলেন, 'রাজ্যে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করতে সকল আগে মুয়াবিয়াকে ধ্বংস করতে হবে। আর এ জন্যে তোমাদেরকে আমার সাথে যোগদান করে মুয়াবিয়ার বিরুদ্ধে জেহাদে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানাচ্ছি।' তারা পাল্টা উত্তর দিল, 'আলি আপনি কোরান অমান্যকারী, আপনি কোরান বুঝেন না।' হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওয়াহাবের নেতৃত্বে বিদ্রোহী খারিজি দল, তাদের ঘাঁটি স্থাপন করলো বাগদাদ থেকে ১২ মাইল দূরে 'নহরওয়ান' নামক স্থানে। বসোরাসহ বিভিন্ন এলাকা থেকে কিছু লোক এসে তাদের সাথে যোগদান করলো। ১২ হাজার সদস্যের খারিজি জঙ্গি দল এখান থেকেই রাষ্ট্রের সর্বত্র খাটি ইসলামি আইন বাস্তাবয়ন করবে। তাদের মূল মন্ত্র হলো রাজ্যের সকল সমস্যার ফয়সালা করবে একমাত্র কোরান।

খারিজিদেরকে নিজ দলে আনতে সকল প্রকার চেষ্টা করে হজরত আলি ব্যর্থ হয়ে ৬০ হাজার সৈন্য নিয়ে সিরিয়া আক্রমণের যাত্রা পথে 'নোখাইল'-এর উপত্যকায় এসে তাবু ফেল্লেন। আলির কাছে সংবাদ এল, সন্ত্রাসী খারিজিরা 'নাহরাওয়ান'-এর গভর্নর হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে খাববাবকে মুরগিকাটা কেটে খুন করেছে, সাথে গভর্নরের অন্তসত্তা ক্রীতদাসী ও বনু-তাঈ গোত্রের তিনজন নিরপরাধ মহিলাকেও অত্যন্ত নির্মমভাবে তারা হত্যা করেছে। বিষয়টা তদন্ত করতে হজরত হারিস ইবনে মুররাহকে 'নাহরাওয়ান' প্রেরণ করা হলো। খারিজিরা ইবনে মুহরাহকেও হত্যা করে ফেলে। আলির সন্দেহ হলো এই মুহূর্তে সিরিয়া আক্রমণ করতে গেলে খারিজিরা কুফা দখল করে নিতে পারে। হজরত আলি খারিজিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিলেন। ৩৮ হিজরির সফর মাসের ৯ তারিখ খারিজিদের সাথে আলির যুদ্ধ হয়, যা ইতিহাসে 'যুদ্ধে নহরওয়ান' বা 'খাল-যুদ্ধ' নামে অভিহিত। আলির শক্তিশালী সৈন্যগণ অতি অল্পসময়ের মধ্যেই খারিজিদের ১২ হাজার সদস্যকে তাদের তলোয়ারের নিচে কতল করতে সক্ষম হলেন। মাত্র ৯জন খারিজি পলায়ন করে প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল। ঐতিহাসিক Sir William Muir-এর ভাষায় : "The Snake was scotched, not killed." বছর দুয়েক পর ৪০ হিজরিতে এই ৯ জনের তিনজন মিলে হজরত আলিকে মসজিদ প্রাঙ্গণে খুন করে।

খারিজিদেরকে হত্যা করে আলি ভেবেছিলেন একটা আপদ গেলো, এবার সিরিয়া আক্রমণ করতে আর কোনো অসুবিধে নেই। কিন্তু বিধি বাম, আলির সৈন্যগণ আর কোনোমতেই যুদ্ধ করতে রাজি হলো না। হজরত আলির বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্যের অধিপতি হওয়ার স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। ভগ্ন হৃদয়ে কুফায় ফিরে গিয়ে আলি নিজের লোকজনকে ভীরু-কাপুরুষ বলে ধিক্কার দিয়ে শান্ত হয়ে যান। এদিকে আলির এই নীরবতা হজরত মুয়াবিয়ার মোটেই ভাল লাগলো না। মুয়াবিয়ার দৃঢ় সংকল্প, 'আমি সেই দিন হবো

শান্ত, যেদিন জগতের মুক্ত বাতাসে নিঃশ্বাস নেয়ার মতো হাশেমি বংশের কেউ থাকবে না।' মুয়াবিয়া জানেন এখন আলি ও মুয়াবিয়ার মধ্যে সিংহ ও ছাগলের ব্যবধান। মুয়াবিয়ার বাবা আবু সুফিয়ান বলেছিলেন, 'শত্রুর প্রতি প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ একদিন আসতেও পারে।' পূর্ণ প্রতিশোধ নেয়ার এখনো কিছুটা বাকি। সুতরাং দুর্বল ছাগলের শক্তিও আলির আছে কিনা পরীক্ষা করতে মুয়াবিয়া দিকে দিকে ছোট্ট ছোট্ট সেনাদল পাঠালেন। আজ থেকে কয়েক যুগ পূর্বে ঠিক যেভাবে নবী মুহাম্মদ রাতের অন্ধকারে একটি একটি করে আরব অমুসলিম গোত্রের ওপর অতর্কিতভাবে হামলা করে তাদের সহায়-সম্পত্তি দখল করেছিলেন, মুয়াবিয়ার সৈনগণ সেভাবেই একের পর এক আলির প্রদেশসমূহ দখল করতে লাগলো। ইসলামের জন্মভূমি ও নবী মুহাম্মদের রাজধানী মদিনা আক্রমণ করার জন্যে সাহাবি হজরত মুয়াবিয়া (রাঃ) হজরত বাশারকে সেনাপ্রধান করে একটি শক্তিশালী দল মদিনা পাঠালেন। হজরত বাশারের সৈন্যবাহিনী দানবের মতো আক্রমণ করে বসে মদিনার মানুষের ওপর। তারা ক্ষণিকের মধ্যেই সাধারণ মানুষের ঘরবাড়ি ভেঙে তছনছ করে দেয়। ভীত-সন্ত্রস্ত মদিনাবাসী বিনা যুদ্ধেই মুয়াবিয়ার সৈন্যবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পন করলো। বিজয়ী বাশার মদিনাবাসীর উদ্দেশ্যে বললেন, 'মদিনার লোক যদি আজ খলিফা মুয়াবিয়ার নির্দেশ নিয়ে না আসতাম, আল্লাহর কসম মদিনার একটা পুরুষও আমি জীবিত রাখতাম না।' সেনাপতি বাশার, নবী মুহাম্মদকর্তৃক বনি মুত্তালিক গোত্রের ওপর আক্রমণের তুলনায় মদিনাবাসীর ওপর অশেষ করুণাই করলেন। সেদিন নবী মুহাম্মদ বনি মুত্তালিক গোত্রের একটা পুরুষকেও জীবিত রাখেন নাই, উপরন্তু তাদের সকল নারীদেরকে বন্দী করে তাঁর সেনাবাহিনীদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। মদিনা জয় করে বাশার, তার দল নিয়ে ইয়েমেন দখল করতে রওয়ানা হলেন। মদিনা পতনের সংবাদ পেয়ে হজরত আলি কাগুজে বাঘের মতো কিছুক্ষণ গর্জন করলেন। কেউ তাঁর কথায় কর্ণপাত করলো না। মদিনার মতো একই পদ্ধতিতে আক্রমণ করে সেনাপতি বাশার ইয়েমন দখল করে নেন। তবে সেখানকার গভর্নর হজরত ওবায়দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বাধা প্রদান করায় তাঁকেও তাঁর ছোট ছেলেকে বাশার হত্যা করেন।

ছোট ছোট রাজ্যগুলো দখল করে হজরত মুয়াবিয়া (রাঃ) এবার দৃষ্টি ফেললেন মিশরের ওপর। সেনাপতিকে নির্দেশ দিলেন, 'তোমরা মিশরের গভর্নর আবু বকরের পুত্র মুহাম্মদকে হত্যা করতে পারবে না, তাকে বন্দী করে আমার কাছে নিয়ে আসবে, আমি নিজ হাতে তার বিচার করবো।' উল্লেখ্য, আবু বকর মদিনার খলিফা হওয়ার পর, হজরত আবু সুফিয়ান তাঁর পুত্র মুয়াবিয়াকে বলেছিলেন, 'এই আবু বকর তোমার দুই ভাইয়ের হত্যাকারী, আমার বিশ্বাস তুমি একদিন এর প্রতিশোধ নেবে।' মুয়াবিয়ার সন্দেহ ছিল আলি কুফা থেকে সৈন্য পাঠিযে মিশর রক্ষা করার চেষ্টা করবেন। কিন্তু আলির পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। সুতরাং মিশর দখল করতে মুয়াবিয়ার সেনাবাহিনীর তেমন বেগ পেতে হলো না। আবু বকরের পুত্র মুহাম্মদকে বন্দী করে মুয়াবিয়ার কাছে নিয়ে আসা হলো। মুয়াবিয়া ঠাণ্ডা মাথায় মুহাম্মদকে বলেন, 'তোমাকে এমন মৃত্যু উপহার দেবো যা খলিফা উসমান হত্যার চেয়ে ভয়ঙ্কর, তরবারি ও বর্শার আঘাতে মৃত্যুর চেয়েও কষ্টদায়ক।' হজরত মুয়াবিয়া আবু বকরের পুত্র মুহাম্মদকে গাধার চামড়ায় মুড়িয়ে বস্তাবন্দী করে তাতে আগুন ধরিয়ে দেন।

মুয়াবিয়ার মনে আছে, বদরের যুদ্ধে তার পিতা আবু সুফিয়ানের বিরুদ্ধে এই আবু বকর, তার পুত্র মুহাম্মদ ও তার কন্যা আয়েশা অংশগ্রহণ করেছিলেন। এ কারণেই মুয়াবিয়া সেদিন 'জামাল যুদ্ধে' হজরত আলির বিরুদ্ধে বিবি আয়েশাকে সাহায্য করেননি। হিজরি ৪০ সনের রমজান মাস। খারিজি দলের তিনজন লোক হজরত আলিকে হত্যার উদ্দেশ্যে মসজিদের পাশে অবস্থান নেয়। আলি মসজিদ থেকে বেরিয়ে দ্বারপ্রান্থে আসামাত্র শাবির ও আব্দুর রহমান ইবনে মুলজাম, হজরত আলির মাথায় বিষ মাখানো তলোয়ার দিয়ে সজোরে আঘাত করে। কিছুদিন পরেই ৬৬১ খ্রিস্টাব্দে (৪০ হিজরি, ১৭ই রমজান, শুক্রবার) হজরত আলি তেষট্টি বছর বয়সে কুফায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এদিকে হজরত আলিকে হত্যা করতে গিয়ে আব্দুর রহমান ইবনে মুলজাম গ্রেফতার হয় জনতার হাতে। আলির মৃত্যুর পর তাঁর বড় ছেলে হজরত ইমাম হাসান (রাঃ) পিতার হত্যাকারী মুলজামকে বস্তায় ভরে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেন।

পিতৃশোকে কাতর হজরত হাসান (রাঃ) বাবার শোকসভায় বলেন, 'আজ এমন একটি পবিত্র মাসে নবীজির শ্রেষ্ঠ মানুষটিকে ঘাতকরা হত্যা করলো, যে মাসে কোরান শরিফ নাজিল হয়েছিল। যে মাসে হজরত ঈসাকে (আঃ) আল্লাহ আকাশে তুলে নেন, যে মাসে হজরত মুসা (আঃ) তুর পাহাড়ে আল্লাহর সাথে কথা বলেন। কোরানের শাসন প্রতিষ্ঠার নামে সন্ত্রাসীরা কোরান লেখককেই খুন করে ফেললো।' উল্লেখ্য, হজরত আলি নবী মুহাম্মদের পাশে পাশে থেকে কোরানের বাণী লিখতেন। হজরত উসমান যখন কোরান সংকলন করেন আলিকে সংকলন কমিটি থেকে বাদ দেয়া হয়। ৩৩ সন্তানের জনক, হজরত আলি জীবনে তাঁর প্রথম স্ত্রী ফাতিমার মৃত্যুর পর আরো ৮ জন রমণীর পাণি গ্রহণ করেছিলেন।

হজরত আলি দুনিয়া ছেড়ে চলে গেলেন, কিন্তু মুয়াবিয়া আলি পরিবারের পিছু ছাড়লেন না। হজরত হাসান (রাঃ) ঘরমুখো নিরীহ, সরল, স্বভাবের মানুষ ছিলেন। রাজনীতি বা ক্ষমতালোভী ছিলেন না, তবে শোনা যায় নারীলোভী ছিলেন। হজরত আলির ভক্তগণের চাপে প্রথমে অস্বীকার করে, পরে অনিচ্ছাকৃতভাবে খেলাফত গ্রহণ করেন। হাসানকে ক্ষমতা থেকে সরানো এখন হজরত মুয়াবিয়ার জন্যে মাটির পুতুল ভাঙার মতোই সহজ। এক নাগাড়ে দীর্ঘ তিন যুগের শাসনকার্য পরিচালনায় দক্ষ মুয়াবিয়া সবগুলো কাজ করেন সুপরিকল্পিতভাবে। তিনি জানেন 'ধর্ম' অশিক্ষিত ও দুর্বল মানুষকে ধোঁকা দেয়ার একটি সহজ অথচ শক্তিশালী অস্ত্র, তা দিয়ে উন্নতশীল রাষ্ট্রগঠন বা গণকল্যাণমুখী কোনো কাজ সাধন হয় না। তাই মাঝে-মাঝে তিনি প্রয়োজনে খুব সতর্কতার সাথে 'ধর্ম' ব্যবহার করতেন, কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনায় ধর্মের ধারে কাছেও যেতেন না। বরং তিনি পার্শ্ববর্তী খ্রিস্টান রাজ্য বাইজানটাইন, আরমানিয়ার রাষ্ট্র পরিচালনা পদ্ধতি অনুসরণ করতেন। পরবর্তীতে ঐ সকল এলাকা দখল করে বহু খ্রিস্টান ও ভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকজনকে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করেন। বহুজাতিক সম্মিলিত প্রচেষ্টায়, রাজতন্ত্রের আদলে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় হজরত মুয়াবিয়া, ধর্মনিরপেক্ষ এক শক্তিশালী রাষ্ট্র গড়ে তোলেন। যুদ্ধকালীন কঠিন দুর্যোগপূর্ণ সময়ে সিরিয়ার জনগণ সবসময় তাদের নেতার পাশে থেকে সমর্থন দিয়েছেন। পক্ষান্তরে হজরত আলির ধর্মতান্ত্রিক ঘুনেধরা পঁচা সমাজ ব্যবস্থায় মানুষ অনাস্থা এনে দলে দলে মুয়াবিয়ার দলে আসতে থাকে। হজরত আলির একান্ত বাধ্য সৈন্যগণ, এমনকি নবী বংশের হজরত হাসানের আপনজন চুরি, দুর্নীতি, মিথ্যাচারে জড়িয়ে পড়েন। হাসান একদিন দুঃখ করে বলেন, 'এই দুনিয়ায় নবীর আদর্শ, কোরান-হাদিসের অনুসারী একজন মানুষও কি বেঁচে নেই?'

হজরত মুয়াবিয়া কুফা ও বসোরার অবস্থা পরখ করার লক্ষ্যে দুইজন গুপ্তচর পাঠালেন। একই সাথে কুফার অদূরে ৬০ হাজার সৈন্য মোতায়েন করে হাসানকে, পত্রমারফত জানিয়ে দিলেন, 'স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পন করো, নইলে অস্ত্রের মাধ্যমে কুফা দখল করা হবে।' হাসান তাঁর পিতার রক্ষিত ৪০ হাজার সৈন্য থেকে, হজরত কায়েসকে সেনাপতি করে ১২ হাজার সৈন্য মুয়াবিয়ার মোকাবিলায় সীমান্তে পাঠিয়ে দিয়ে, নিজে পারস্যের প্রাচীন বিলাসবহুল কুসুম কাননে বিশ্রাম নেন। বিশ্রামরত অবস্থায় হাসানের কাছে খবর এলো সেনাপতি হজরত কায়েস আর বেঁচে নেই। সৈন্যগণ রণভঙ্গ দিয়ে পলায়ন করেছে। পালিয়ে আসা হাসানের নিজের সৈন্য ও বিক্ষুব্ধ জনতা দৌড়ে এসে তাঁর রঙ্গমঞ্চের তাঁবু ছিড়ে-ভেঙে, ছিন্নভিন্ন করে তাদের মনের ক্ষোভ ও ঘৃণা প্রকাশ করলো। যে মখমল কার্পেটে বসে তিনি আয়েশে আরাম করছিলেন, একজন লোক হেঁচকা টানে কার্পেটটি উঠিয়ে নেয়। তারা হাসানকে 'কাফের'-'মুশরিক' বলে গালি দিতে লাগলো। অবস্থা বেগতিক দেখে হজরত হাসান পালিয়ে আত্মগোপন করলেন। ভীরু, কাপুরুষ, নারীলোভী হাসান, মুয়াবিয়ার কাছে সংবাদ দিলেন, তিনি বিনা যুদ্ধে দুটি শর্তে আত্মসমর্পন করতে রাজি। শর্তনামায় হজরত হাসান লিখলেন : (এক) কুফায় বাবার পৈত্রিক সম্পত্তি, রাজস্বখাতে জমাকৃত সোনা-দানা, টাকা-পয়সা আমাকে দিতে হবে, যাতে বাকি জীবনটুকু কাটাতে আমাকে আর্থিক সমস্যায় পড়তে না হয়; (দুই) আমার বাবা ও আমাদের পরিবারের নামে জুমার নামাজে খুতবাপাঠে অভিশাপ দেয়া বন্ধ করতে হবে।

মুয়াবিয়া ইচ্ছে করলে বলপূর্বক কুফা দখল করতে পারতেন। কুফার সামান্য ধনের পিপাসা মুয়াবিয়ার নেই, আছে নবী মুহাম্মদের বংশের রক্তপান করার নেশা। বুদ্ধিমান মুয়াবিয়া অপ্রয়োজনে তাঁর একটি সৈন্যও হারাতে রাজি নন। হাসানের দুটো শর্তই তিনি মেনে নিলেন। তবে দ্বিতীয় শর্তের ব্যাপারে বললেন, রাষ্ট্রীয়ভাবে আলি পরিবারকে অভিশাপ দেয়ার বাধ্যবাধকতা উঠিয়ে দেয়া হলো, তবে জনগণ যদি স্বেচ্ছায় তা চর্চা করে তাতে সরকারের কিছু বলার থাকবে না। হজরত আলির অন্ধ সমর্থক, বেঁচে থাকা অবশিষ্ট শিয়াদের পানে 'ব্যক্তি স্বার্থপর' হাসান ফিরে তাকালেন না। রাজস্ব কিছু সম্পদ নিয়ে স্বপরিবারে মদিনায় চলে যান। কুফায় হাসান আত্মসমর্পন করার কিছুদিন আগেই, বসোরার গভর্নর (নবীবংশের) ওবায়দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হজরত মুয়াবিয়াকে চিঠি লিখে আত্মসমর্পন করে তার দলে যোগ দিয়েছিলেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) রাষ্ট্রীয় সম্পদ চুরির অভিযোগে আলির যুগেই অভিযুক্ত হয়েছিলেন। স্বেচ্ছায় বসোরার গভর্নরপদ ত্যাগ করার আগে রাজভাণ্ডার শূন্য করে নিয়ে যান। মুয়াবিয়া এখানেও অসন্তুষ্ট হলেন না। এখন শুধু হাসান আর হোসেনের প্রাণ দুটো হাতে এলেই হয়। মুয়াবিয়ার মিশন সম্পূর্ণ কমপ্লিট।

সমস্ত আরব বিশ্বের একচ্ছত্র অধিনায়ক সম্রাট মুয়াবিয়া রাজকীয় বেশে কুফায় প্রবেশ করলেন। জনগণ প্রফুল্লচিত্তে ফুলের মালা দিয়ে তাঁকে বরণ করলো। কুফা নগরীকে বসোরার অন্তর্ভুক্ত করা হলো। দামেস্ক হলো মুসলিম সাম্রাজ্যের রাজধানী। এবার গোপনে সকলের অগোচরে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলে নিলেই হয়। হজরত মুয়াবিয়া (রাঃ) গুপ্তচরের মাধ্যমে, হজরত হাসানের স্ত্রী জায়েদা বিনতে আশাত বিন কায়েসকে জানিয়ে দিলেন, 'জায়েদা যদি তার স্বামী হাসানকে হত্যা করতে পারে, তাহলে তাকে একলক্ষ দিরহাম পুরস্কার দেয়া হবে এবং খলিফার পুত্রবধু করে রাজপ্রাসাদে নিয়ে যাওয়া হবে।' একদিন হাসান রোজা ছিলেন। জায়েদা তার স্বামীকে দুধে বিষ মিশিয়ে ইফতার করতে দেন। বিষ পানের চল্লিশ দিন পর ৬৭০ খ্রিস্টাব্দে আরবি ৫০ হিজরির সফর মাসে হজরত হাসান

(রাঃ) ইহলোক ত্যাগ করেন। জায়েদা স্বামীকে হত্যা করে যখন মুয়াবিয়ার কাছে তার পুরস্কার দাবি করলেন, মুয়াবিয়া জায়েদাকে একলক্ষ দিরহাম পাঠিয়ে দিয়ে বললেন, 'স্বামী হত্যাকারী মহিলাকে আমার পুত্রবধু বানাতে পারি না।'

মুয়াবিয়া এবার ভাবলেন, নিজে ক্ষমতায় থাকতেই, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা উমাইয়া বংশের হাতে রাখার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করতে হবে। প্রথমে বিশ্বস্ত ব্যক্তিবর্গের সাথে আলোচনা করলেন। স্বপুত্র এজিদকে রাজপুত্র ঘোষণা দিয়ে রাজতন্ত্র কায়েম করবেন। বিষয়টা সারা দেশে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করলো। হজরত মুয়াবিয়া তাঁর পুত্র এজিদকে 'রাজকুমার' না 'খলিফা' ঘোষণা দিয়েছিলেন এবং গণতান্ত্রিক পন্থায় জনগণের সমর্থনে, না বল প্রয়োগ করে পুত্রের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্পণ করেছিলেন, এ নিয়ে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে সীমাহীন মতোবিরোধ দেখা যায়। আমরা প্রবন্ধ সংক্ষিপ্ত রাখার লক্ষ্যে দু-একটি উদাহরণের প্রতি আলোকপাত করবো :

ইবনে খালেদুন (Ibn Khaldoun) তাঁর '*Qayd Al-Shareed min Akhbar Yazeed*' বইয়ের ৭০ পৃষ্ঠায় বলেছেন : "Mu`awiyah was eager for people's agreement to give allegiance to his son Yazeed. He resolved to take allegiance to Yazeed as a crown prince. So he consulted the grandest companions, the masters of the people and the district's governors. They all accepted. Delegations from the districts came with acceptance to give allegiance to Yazeed. Many Companions gave him the allegiance as well. Hafij Abdul ghoni says,`His (Yazeed's) caliphate is reightful, sixty of the companions of the prophet give him the allegiance. Abdullah Ibn`Umar was one of them."

এই তথ্যানুযায়ী নবীর সহচরী ৬০ জন সাহাবি স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুয়াবিয়ার প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন, সুতরাং এজিদকে ইসলাম বিরোধী বললে সাহাবিদেরকেও অপমান করা হবে। হয় এজিদ ও সাহাবিগণ সত্যের পথে ছিলেন, না হয় যে অপরাধে এজিদ দোষী, সেই অপরাধে সাহাবিগণও দোষী।

মুয়াবিয়া তাঁর পুত্র এজিদকে বলেন,

> "O my son, I have arranged everything for you, and I have made all the Arabs agree to obey you. No one will now oppose you in your title to the caliphate, but I am very much afraid of Husayn Ibn Ali, Abdullah Ibn Umar, Abdur Rahman Ibn Abu Bakr, and Abdullah ibn Zubayr. Among them Husayn Ibn Ali commands great love and respect because of his superior rights and close relationship to the Prophet. I do not think that the people of Iraq will abandon him until they have risen in rebellion for him against you. As far as possible, try to deal with him gently. But the man who will attack you with full force, like a lion attacks his prey, and who will pounce upon you, like a fox when it finds as opportunity to pounce, is Abdullah Ibn Zubayr. Whenever you get a chance, cut him into pieces." (দ্রষ্টব্য : '*ইক্বদ আল ফারিদ*' (Iqd all Fareed), ভলিউম ৪, পৃষ্ঠা ২২৬)।

আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়েরকে এজিদ কেটে কুটরো টুকরো করেছিলেন কিনা জানা যায়নি তবে পিতার অসম্পূর্ণ কাজটি তিনি পূরণ করেছিলেন। এজিদ অত্যন্ত নৃশংস, অমানুষিকভাবে হজরত হোসেনকে (রাঃ) কারবালা প্রান্তরে স্বপরিবারে হত্যা করেন। মৌলানা সাঈদ কুতুবের লেখা '*Social Justice in Islam*' (আরবি ভার্সন *Adalah al-ijtima iyah fi al-Islam*) বইয়ে আমরা আরও দেখতে পাই[২৩] :

> "After the oath was taken to Yazid in Syria Mu`awiya gave Syed ibn'Aas the task of gaining the acceptance of the people of the Hejaz. This he was unable to do, so Mu`awiya went to mecca with an army and with full treasurey. He called together the principal Muslims and addressed them thus: "You all know that I have lived among you, and you are aware also of my ties of kindred with you. Yazid is your brother and your nephew. It is my wish that you take the oath of allegiance to Yazid as the next Caliph; then it will be you who will bestow offices and depose from them, who will collect and apportion money." He was answered by Adullah ibn Zubair, who gave him a choice of three things to do, first he might do as Allah's Messenger had done and appoint no successor, second he might do as Abu Bakr had done and nominate a successor, third he might do as Umar had done, and hand over the whole matter to a council of six individuals,

[২৩] Sayyid Qutb, *Social justice in Islam*, Islamic Publications International, New York, USA, 2000, Page 209-210.

> none of whom was a member of his own immediate family. Mu`awiya's anger was kindled, and he asked "Have you any more to say?" "No". Mu`awiya's turned to the remainder of the company" "And you?" "We agree with what Ibn Zubair has said", they replied. Then he addressed the meeting in threatening terms: "The one who warns is blameless. I was speaking among you, and one of you was bold to get up and call me a liar to my face. That I will bear and even forgive. But I stand to my words, and I swear by Allah that if any of you speaks one word against the position that I take up, no word of answer will he receive, but first the sword will take his head. And no man can do more than save his life.
>
> Thereupon the commander of Mu`awiya's guard ordered two to stand over each of the nobles of the Hejaz who opposed him and to each he said, "If your man leaves his guards to speak one word, either for me or against me, then let the guards strike off his head with their swords". Then he mounted the pulpit and proclaimed: "These men are the Leaders and the choicest of the Muslims; no matter can be successfully handled without them, nor can any decision be taken without their counsel. They are now satisfied to take the oath to Yazid and have indeed already taken that oath by the name of allah". So the people took the oath. " (ঈষৎ সংক্ষেপিত) ।

মৌলানা হজরত রসিদ আখতার (দেওবন্দি) তাঁর '*তাহজীব আওর তামাদ্দুনে ইসলাম*' বইয়ের ১ম পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন, হজরত মুয়াবিয়া (রাঃ) সাধারণ মানুষকে জোরপূর্বক এজিদকে খলিফা মানতে বাধ্য করেছিলেন । একই বক্তব্য পাওয়া যায় সিরিয়ান লেখক হজরত রসিদ রেজার 'ইমামাতুল উজমা' বইয়ের ৯৯ পৃষ্ঠায় । অধ্যাপক সাইয়্যেদ আকবর এলাহাবাদী '*মুসলমানৌ কা উরজ ও জাওয়াল*' গ্রন্থের ৫৩ পৃষ্ঠায় এবং সাইয়্যেদ আবুল আলা মৌদুদি '*খেলাফত আওর মুলকিয়াত*' পৃষ্ঠা ১৬৪-১৬৫ বইয়ে, উভয়েই মুয়াবিয়াকে অন্যায়ভাবে জোরপূর্বক এজিদকে খলিফা মানতে বাধ্য করার দায়ে অভিযুক্ত করেন ।[২৪] (দ্রষ্টব্য : *খেলাফত ও রাজতন্ত্র*, পৃষ্ঠা ১৫০-১৫২) ।

তবে সুখের কথা হলো, কোনো প্রকার সংঘাত, প্রাণহানি ছাড়াই হজরত মুয়াবিয়া তাঁর রাজতন্ত্র কায়েম করার ইচ্ছে সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে পেরেছিলেন । ৬৮০ খ্রিস্টাব্দে মুয়াবিয়ার মৃত্যুর পর, এজিদ তার পিতার স্থলাভিষিক্ত হন । উমাইয়া বংশ ৬৬১ থেকে ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এক নাগাড়ে প্রায় ৯০ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন । তাই হজরত মুয়াবিয়া (রাঃ) আরব বিশ্বে 'উমাইয়া রাজতন্ত্রের স্থপতি' হিসেবেই চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন ।

অসত্য, মিথ্যা, প্রতারণা, প্রবঞ্চণার উপর ভিত্তি করে যে ইসলামি সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়, জগতের অগণিত নিরপরাধ শিশু-নারী-পুরুষের রক্ত পান করে যার বিকাশ, প্রাসাদ ষড়যন্ত্র তার বেঁচে থাকার অবধারিত অধ্যায়, অনিবার্য অবলম্বন ।

অন্যান্য সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

(১) আবুল ফজল, হজরত আলী, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ২০০৩ ।

(২) মুহাম্মদ বরকতুল্লাহ, হজরত ওসমান, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৯৪ ।

(৩) স্যর সৈয়দ আমীর আলী, *এ শর্ট হিস্ট্রি অব স্যারাসিনস*, মল্লিক ব্রাদার্স, কলিকাতা, (প্রথম প্রকাশ ১৯৯২), ২০০৫ ।

(৪) Sir William Muir, *The Caliphate: Its Rise, Decline, and Fall*, Revised edition by T. H. Weir. John Grant, Edinburgh, 1924; The internet version can be read at: http:// www.answering-islam.org/Books/Muir/Caliphate/

(৫) Muhammad b. Yasr Ibn Ishaq, *Sirat Rasul Allah*, 'The Life of Muhammad', (translated in English by A. Guillaume), Oxford University Press, London, 1955, 2004.

(৬) Abu Jafar Muhammad ibn Jarir al-Tabari, *The History of Al-Tabari,* Vol. 17: The First Civil War: From the Battle of Siffin to the Death of Ali. Translated by Hawting, State University of New York Press (SUNY), N.Y., USA.

(৭) Abu Jafar Muhammad ibn Jarir al-Tabari, *The History of Al-Tabari,* Vol. 18: Between Civil Wars: The Caliphate of Mu'awiyah AH 40-60. Translated by M.Morony, State University of New York Press (SUNY), N.Y., USA.

[২৪] S.A. Mawdudi, *Khilafat wa Mulukiyyat*, published by Idara Tarjuman ul Quran, page 164-165

(৮) Saiyid Safdar Hosain, *The Early History of Islam*, Vol 1 & 2, Low Price Publications, Delhi, India, (First Published 1933), Reprinted 2006.
(৯) Syed Ameer Ali, *The Spirit of Islam*, Low Price Publications, Delhi, India, (First Published 1923), Reprinted 2002.

সমাপ্ত